দুখে যাত্রা

সংকলন ও সম্পাদনা

অধ্যাপক মোহিনীমোহন সরদার ও মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

DUKHE JATRA
edited by Prof. Mohini Mohan Sardar & Mrityunjay Mandal
Published by Jayanta Shee
The Shee Book Agency
201A, Muktaram Babu Street, Kolkata 700 007, Mo. 9874168470
E-mail- thesheebookagency@gmail.com

ISBN 978-93-83816-16-3

গ্রন্থের সর্বস্বত্ব সম্পাদকদ্বয় দ্বারা সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : পুণ্য রথযাত্রা, ১৪ জুলাই, ২০১৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ, ২০২২

দি শী বুক এজেন্সি-র পক্ষে ২০১ এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০৭ থেকে জয়ন্ত শী (৯৮৭৪১৬৮৪৭০) কর্তৃক প্রকাশিত এবং কমলা প্রেস, ২০৯ এ, বিধান সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : দুশো টাকা (২০০.০০)

উ ৎ স র্গ

পিতা-মাতার হাত ধরে পথচলা
আমাদের স্বপ্নের সমাবেশ...

সূচি

বনবিবি ও দুখের কথা
৭
দুখে যাত্রার বিষয়বস্তু
২৯
দুখে যাত্রা (মূলগ্রন্থ পাঠ)
৪১
পরিশিষ্ট (শব্দতত্ত্ব ও তথ্যাবলীর চিত্র)
১০৪
গ্রন্থপঞ্জি
১২৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বন্ধুমহল নাট্যসংস্থা, কালীতলা, হেমনগর কোস্টাল (হিঙ্গলগঞ্জ), উত্তর ২৪ পরগনা

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

গওসিয়া লাইব্রেরী, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলকাতা

ওস্‌মানিয়া লাইব্রেরী, মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, কলকাতা

Jhingakhali Beat, Basirhat Range, Sundarban Tiger Reserve

স্বর্গীয় বিশ্বনাথ মণ্ডল, স্বর্গীয় রঞ্জন দাস অধিকারী (শিক্ষক)

মানবেন্দ্র বিশ্বাস (শিক্ষক, কালীতলা হাইস্কুল), জগদীশ মণ্ডল (শিক্ষক কালীতলা হাই স্কুল), আশিস গায়েন, পৃথ্বীশ মণ্ডল, পীযূষ নন্দী, ইমরান আলীমুন্সী, সুভময় কোনার, সাগর দাস, দেবলীনা সরকার, দিব্যজ্যোতি মণ্ডল, রাকিবুল হাসান বিশ্বাস, আবদুল আলীম গাজী

শুভ, শুভঙ্কর, চিরঞ্জিৎ, দীপা, প্রদীপ, বিশ্বজিৎ, অসিত, দেবাশীষ, বিকাশ, প্রমিলা, স্বাগতা

কানন বালা, সবিতা, নমিতা, সঞ্জয়, শিবানী, শিপ্রা, প্রতিমা

দেবার্ঘ, সোস্তাই, রাই
মাহি
ও
আবর্ত

বোনবিবি ও দুখের কথা

সুন্দরবন পৃথিবীর বিস্ময়। তাই সুন্দরবনের রহস্যময় বন্যপ্রকৃতিকে দেখার জন্য ছুটে আসেন সৌন্দর্যপিপাসু বহু মানুষ। কিন্তু আলোর নীচে অন্ধকারের মত এই সৌন্দর্য ও রহস্যমণ্ডিত প্রকৃতির কোলে লালিত মানুষগুলির জীবনচর্যা ও লৌকিক সংস্কৃতি প্রায় থেকে যায় অবহেলিত। জীবন যাপনের বর্ণময় প্রকাশ ধরা পড়ে প্রচলিত সংস্কৃতির পরতে পরতে। নদীবক্ষে মাছ ধরা, নদীকূলে চিংড়িপোনা সংগ্রহ, কাঠ ও মধু সংগ্রহ এবং কৃষিকাজ এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা। আর এই জীবিকা অর্জনের পিছনের ইতিহাসও করুণ। লাঞ্ছিত-বঞ্চিত এই মানুষগুলো খেয়ে ও পরে জীবনসংগ্রামে কোনও রকমে টিকে আছে। এদের কথা পৃথিবীর উন্নতিকামী মানুষগুলির কাছে অজ্ঞাত। যদিও বর্তমানে অনেকেই রহস্যঘেরা সুন্দরবনের রহস্য উন্মোচনের জন্য কলম ধরেছেন।

নানাজন নানা বিষয় নিয়ে সুন্দরবন সম্পর্কে লিখেছেন ও লিখছেন। আমরা চেষ্টা করলাম সুন্দরবন অঞ্চলের লৌকিক সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ 'দুখে যাত্রা-র পালা সম্পর্কে কিছুটা তথ্য পরিবেশন করতে।

দুই ২৪পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের 'দুখে যাত্রা' বা 'বনবিবির পালা' বাংলা লোকনাটকে অনেককাল আগেই স্থানলাভ করেছে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের লোকনাটক যেমন— পুরুলিয়ার 'ছৌ', মালদহের 'গম্ভীরা', মুর্শিদাবাদের 'আলকাপ' প্রভৃতি যতখানি আলোচিত ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, সুন্দরবন অঞ্চলের 'দুখে যাত্রা' ততটাই থেকেছে অনালোচিত।

বর্তমান নিবন্ধে সুন্দরবন অঞ্চলের লোকনাটক যার প্রচলিত গ্রাম্য নাম 'দুখে যাত্রা'র পরিচয়, উৎস, তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধানের পূর্বে এই অঞ্চলের মানুষ ও তার পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক অবহিতির প্রয়োজন। কারণ, লোকদেবতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নাট্যভাবনার উৎসে আছে মানুষের বাঁচার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশ। পরিবেশ থেকেই কল্পিত হয় লোক দেবতার রূপ, বাহন, থান ও সৃষ্টি হয়

দেবতার মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক লোকগান, লোকউৎসব, লোকনাটক, যাত্রা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোকবিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির নানা অনুসঙ্গ।

সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ ও পরিবেশ বলতে বোঝায় ছোট বড় নদ-নদী, মাঠ-ঘাট, খাল-বিল, বন-জঙ্গল, কৃষিভূমি, বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পেশার মানুষ। এই আধি-ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে পড়ে 'ডাঙায় বাঘ-জলে কুমীর', শ্বাপদ প্রভৃতি জলচর ও উভচর প্রাণি। আবার লোকালয় ও জঙ্গলে আছে বিষধর সাপ—গোখ্‌রো, কেউটে, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি।

আধি-দৈবিক বিপদের মধ্যে আছে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত, বন্যা, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি প্রভৃতি। আর রোগের মধ্যে কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া ইত্যাদি। এছাড়া নিত্য লেগে আছে জলদস্যু বা বনডাকাতের ছিনতাই-লুঠতরাজ, যা লোকালয় থেকে শুরু করে বনের কাঠুরিয়া, নদীর জেলে, মাঝি-মাল্লার পর্যন্ত সাধারণ মানুষের চোখের ঘুম কেড়ে নেয়।

ভয়ংকর প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতে বাস করেও এখানকার মানুষ বাঁচার স্বপ্ন দেখে। তাই শুধু মাত্র বাঁচার তাগিদে, সুস্থ সুন্দরভাবে জীবন ধারণের ইচ্ছায় এখানকার সাধারণ মানুষ আঁকড়ে ধরেছে কল্পিত লোকদেবতাকে। পূজাপার্বণের মধ্যে খুঁজে ফিরেছে সুখ ও সান্ত্বনা। বেঁচে থাকার কষ্ট ভুলতে, ভয়ঙ্কর 'ডাঙায় বাঘ জলের কুমীরে'র হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে 'জাদুবিদ্যায়'। দুর্বল হয়েছে মানুষের প্রতি বিশ্বাস। শুধু মাত্র বাঁচার তাগিদেই, প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন তা তারা লোকদেবতার পূজার্চনার মাধ্যমে লাভ করতে সচেষ্ট হয়েছে। নিজেদের মঙ্গলার্থে লোকদেবতার মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক লোকযাত্রার বা লোকগানের আসর বসিয়ে এখানকার মানুষ একটু বাঁচার রসদ খুঁজে চলেছে আজও। এভাবেই লোকদেবতাদের উপর আঞ্চলিক পরিবেশগত প্রভাব যেমন সুস্পষ্ট হয়েছে, তেমনই লোকদেবতা কেন্দ্রিক গান এবং যাত্রাতেও আঞ্চলিকতা জায়গা করে নিয়েছে।

২

"আঠারো ভাটির মাঝে আমি সবার মা
মা বলে ডাকিলে কারো বিপদ থাকে না।"

এ ভাবেই লোকদেবী 'বনবিবি' সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের মনে ও মননে জায়গা করে নিয়েছে ও নিচ্ছে। সুকুমার সেনের 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বনবিবির উৎস সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর মতে দেবী মঙ্গলচণ্ডী বা বনদুর্গা হলেন বনবিবি। বনবিবির পাঁচালী রচিত হয়েছে সুন্দরবনের 'মউল্যা' অর্থাৎ মোম-মধু

সংগ্রাহকদের বিশিষ্ট অধিদেবতাকে উপলক্ষ্য করে। সুকুমার সেনের কথায়— "মউলে-কাঠুরে-ব্যাধ পশুপালকদের অধিদেবতা বনদুর্গার বা মঙ্গলচণ্ডীর রূপান্তর হলেন—বনবিবি।"[১] বনবিবির পালাগানে বা 'দুখে যাত্রা'য় লক্ষ্য করা যায় কাকা ধনার সঙ্গে দুখেকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দুখের মা সন্তানের মঙ্গলকামনায় কান্নাকাটি করে অন্ধ হয়ে গেছে এবং দুখের প্রত্যাবর্তনের পর বনবিবির কৃপায় হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। এভাবে সমাজ-বাস্তবতার কঠোর পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সন্তানের মঙ্গল কামনায়, জঙ্গলযাত্রী স্বামী-পুরুষের সুভকামনায় বনবিবি আরাধ্যা দেবী হিসেবে ঘরে ঘরে পূজিত হয়ে আসছে।

মুন্সী বয়নুদ্দীন সাহেব রচিত 'বনবিবির জহুরানামা' (১২৮৪ বঙ্গাব্দ/১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) গ্রন্থে হিন্দু সমাজের কল্পিত দক্ষিণরায় ও মুসলমান সমাজের কল্পিত বনবিবির একটি মিশ্র কাহিনি পাওয়া যায়। প্রখ্যাত মঙ্গলকাব্য গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—

"ইহাই রায়মঙ্গল কাহিনীর মুসলমানী সংস্করণ।
ইহার মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর কোনও প্রভাব নেই'।[২]

তিনি বনবিবি বা দুখের কাহিনিতে চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব নেই বলে উল্লেখ করেন। জলে কুমীর ও ডাঙায় বাঘের উপদ্রবের থেকে মুক্তিলাভের জন্য হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বনবিবি, বড়খাঁ গাজির মত লৌকিক দেবতার কল্পনা করেছেন।

বনবিবিকেন্দ্রিক সাহিত্যকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। তবে প্রত্যেকটা শ্রেণি একে অপরের উপর নির্ভর করেই সম্পূর্ণ। কোনো ভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আসলে লোকসংস্কৃতির শ্রেণিকরণ আপাত একটা ভাগমাত্র। ভাগের নেপথ্যে কাজ করে ফল্গুধারার মত পারস্পরিক যোগ। বনবিবির পালাও লোকজীবনের গ্রাম্যসংস্কৃতি; লোকসমাজ তো খণ্ড খণ্ড ভাবে জীবনযাপন করে না, তাই এই পারস্পরিক সংযোগ। এখন বনবিবি সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাগুলিকে একটি ছকের সাহায্যে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো—

সুন্দরবন অঞ্চল [হিঙ্গলগঞ্জ/উঃ ২৪পরগনা ও কালীতলা গ্রাম]

দুখেযাত্রা/বনবিবিকেন্দ্রিক লোকসাহিত্য

- লিখিত পুথি
- অঞ্চল ভিত্তিক প্রচলিত পালাগান ও লোকযাত্রা এবং লোকনাট্যের মৌখিক রূপ
- বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসাহিত্য ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লিজেন্ট প্রভৃতিতে ব্যবহৃত কাহিনি।

প্রথম ভাগটি সম্পর্কে বলা যায়— লিখিত সাহিত্য বলতে কিছু মুসলিম কবিদের লেখা 'ইসলামি' পুথি বনবিবির সাহিত্য ধারার প্রাচীনতাকে চিহ্নিত করছে। এরকম তিনখানি লিখিত পুথির সন্ধান পাওয়া গেছে—

১। মুন্সী বয়নুদ্দীন সাহেব রচিত :

'বনবিবির জহুরানামা' (১২৮৪ বঙ্গাব্দ / ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ) এই পুথিটি প্রাচীনতম। বয়নুদ্দীন সাহেব সপ্তদশ শতকে শেষ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের কবি। পুথিখানি সর্বপ্রথম ১২৮৪ সালে মুদ্রিত হয়ে ৩৩৭/২ আপার চিৎপুর রোড, আফাজদ্দীন আহমত কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৩]

২। বনবিবির কেচ্ছাগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত, হাওড়া জেলার বালিয়া গোবিন্দপুর নিবাসী মোহম্মদ হেছামুদ্দীন পুত্র মরহুম মোহাম্মদ খাতের বিরচিত 'বোনবিবি জহুরানামা নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা'টি রচিত হয়েছে শুক্রবার, ৭ই কার্তিক, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ এবং গওসিয়া লাইব্রেরি, ৩০ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত। পুথি অনুযায়ী মুনসী খাতের হাওড়ার বালিয়া গোবিন্দপুরের গ্রামের বাসিন্দা।

৩। বনবিবির অপর কাব্যটির প্রণেতা আবদুর রহিম সাহেবের বসতি 'ভুরসুট কানপুরে'। রচনাকাল ১৩০৫ বঙ্গাব্দ। ভনিতায় নিজেকে মেলে ধরেন—

"কহে মোহম্মত মুনসী জোনাবে সবার
ভুরসুট কানপুরে বসতি আমার।
শেক দারাজতুল্লা জান আমারওয়ালেদ,
আল্লাতালা পুরা করে দেলের মকচ্ছেদ।"[৪]

কাব্যের আরও একটি ভনিতায় পাই—

"কহে হীন আছিরদ্দিন জনাব সবার
চব্বিশ পরগনা বিচে বসতি যাহার।"[৫]

এই পুথিটির প্রকাশক মোহম্মদ নুরুল ইস্‌লাম। ওসমানিয়া লাইব্রেরি, ৩০ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রিট, কলকাতা থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত ও মুদ্রিত। রচনাকাল ১২ই ফাল্গুন। গ্রন্থনাম— 'বনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি'। গ্রন্থারম্ভে তারকাখচিত চতুষ্কোণের মধ্যে অবশ্য আরো একটি তিন লাইনের নামপত্র পাওয়া যায়—

"বোনবিবির কেরামতি অর্থাৎ
বোনবিবি জহুরানামা
ধোনা মৌলে দুঃখের পালা"

যাইহোক, আপাত তিনজন কবির লেখা পুথির সন্ধান পাওয়া গেলেও, আগামী

দিনে 'বনবিবি সাহিত্যে'র আরও লিখিত পুথির সন্ধান আমরা পাব না— একথা নিশ্চিত করে বলা ঠিক হবে না। আমরা আশা রাখি আগামী দিনে সুন্দরবন কেন্দ্রিক 'দুখে যাত্রা' বা 'বনবিবি পালা'র আরও অনেক নিদর্শন আমাদের হাতে আসবে এবং বনবিবিকেন্দ্রিক গবেষণার জগৎ দৃঢ় ও সমৃদ্ধ হবে। তবে বিভিন্ন কবির হাতে বনবিবির, পালা রচিত হলেও মূলকাব্যের বিষয়গত ভাবনায় খুব একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। তাই বিষয় বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে বনবিবি কাব্যের কাহিনিকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

১। আঠারো ভাটির দেশে বনবিবি ও শাজঙ্গলীর আগমন— আঠারো ভাটির দখল নিয়ে নারায়ণী ও বনবিবির প্রথমে যুদ্ধ ও বনবিবির কর্তৃত্ব লাভ।

২। ধনামৌলে ও দুখের কাহিনি— ধনা মৌলের মহল যাত্রা ও দুখেকে দক্ষিণ রায়ের কাছে সমার্পন, বনবিবির কৃপায় দুখের মুক্তি এবং বনবিবির দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা ও মাহাত্ম্য প্রচার।

উল্লিখিত বনবিবির তিনটি পুথিতে কাহিনিগত পার্থক্য খুব কমই। বরং সাম্যতা বেশি। পালাগানের একটি ধারায় সংগীতের প্রাধান্য বেশি, সেখানে সমগ্র কাহিনি বিবরণধর্মী গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। এমনই 'বনবিবির' একানি-পালা' দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর, ক্যানিং রেলস্টেশান মধ্যবর্তী সংলগ্ন এলাকায় প্রচলিত। পালাগানের অপর ধারাটিতে সংলাপের প্রাধান্য বেশি। এটি বনবিবি পালার সবচেয়ে জনপ্রিয় রূপ। সুন্দরবনকেন্দ্রিক উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিভিন্ন অঞ্চলে এর অভিনয় এখনও সকলকে আকর্ষণ করে। দুই চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিকতার বাঁকে বাঁকে বনবিবির এই দ্বিতীয় শ্রেণির পালাগানের নামকরণের বিবর্তন চোখে পড়ার মতন। আঞ্চলিক তথা ভৌগোলিক পরিবেশ ও মানুষের জীবন যাত্রার বৈচিত্র্য এবং উচ্চারণ বৈষম্য এই নামকরণের মূল কারণ বলে মনে হয়। যেমন—

উত্তর ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে : দুখে যাত্রা, বনবিবির পালা, বনবিবির গান, বনবিবি যাত্রাপালা, বোন্‌বিবির পালা বা যাত্রা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে : বওনবিবি পালা, বনবিবি যাত্রা বনবিবির পালা বা বনবিবির যাত্রা।

ইসলামি পুথিগত সমস্ত কাহিনিকে পালাকাররা দর্শকের সামনে পালার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। গীতবহুল-সংলাপধর্মী পালাটি সাধারণত অভিনয় করতে সাড়ে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ সারা রাত ধরে এই সমস্ত পালার অভিনয় দেখতে অভ্যস্ত। তবে অনেক বয়স্ক অভিজ্ঞ মানুষের মুখে শোনা যায়, ইসলামি পুথি অনুযায়ী— সমস্ত পালাটি পরিপূর্ণভাবে শেষ হতে প্রায় আট ঘণ্টা

সময় লাগে। বর্তমানে যে সমস্ত পালা অভিনয় হচ্ছে তার সময়সীমা পূর্বকৃত পালাপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত। দুই ২৪পরগনার কর্মব্যস্ত মানুষ সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে 'বনবিবি'র পালার দ্বিতীয় অংশ তথা ধনামৌলে ও দুখের কাহনিটিকে দর্শকের সামনে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। সংলাপ ও গীতিধর্মিতা দুই ২৪পরগনার পালার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে দক্ষিণ ২৪পরগনার তুলনায় উত্তর ২৪পরগনার পালা গুলিতে সংলাপই প্রাধান্য বেশি। উত্তর ২৪পরগনার কালীতলা অঞ্চলে যে সংক্ষিপ্ত বনবিবি পালাটি অভিনীত হয় তা জনসাধারণের মুখে 'দুখে যাত্রা' নামে পরিচিত। আমাদের আলোচ্য সংকলনের পালাটি সংগ্রহ করা হয়েছে উত্তর ২৪পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত কালীতলা গ্রাম থেকে। সংক্ষিপ্ত আকারে 'দুখে যাত্রা'র এই অংশটি পাওয়া গেছে কালীতলা হাই স্কুলের শিক্ষক ও পালাকার মানবেন্দ্র বিশ্বাসের কাছ থেকে। যাত্রার বইটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন কালীতলা হাইস্কুলের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জগদীশ মণ্ডল মহাশয়। সংগৃহীত পালাটিকে গ্রন্থ আকারে বর্তমান পাঠের চেহারায় আনা হয়েছে।

৩

'বনবিবি' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুটি শব্দ পাই—

বন = অরণ্য / জঙ্গল / বাদাবন / বাদা অঞ্চল

বিবি = মুসলমান কুলবধূ। আবার ইংরেজ কন্যাকেও বাংলা পরিভাষায় 'বিবি' বলা হয়।

সুতরাং 'বনবিবি' শব্দটি অর্থ করলে দাঁড়ায় 'বনের বিবি' অর্থাৎ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আবার মুসলমানি সংস্করণ বনের কুলবধূ। আর এই 'অরণ্যদেবী' বা 'বনের বিবি' 'অরণ্যের কুলবধূ' অরণ্যের রক্ষাকর্ত্রী। হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণি মানুষই ভক্তির আতিশয্যে মাতৃসমা কুলবধূকে দেবীপদে উন্নীত করেন। ভক্তির প্রভাবে বনদেবী মুসলিম সমাজে প্রথম পূজিত হলেও পরবর্তী সময়ে হিন্দু সমাজেও তিনি দেবীরূপে পূজিত হয়েছেন।

বনবিবির এই নাম থেকেই ধারণা করতে পারি যে, বনবিবি বনের অধিষ্ঠাত্রী। বনবিবির অস্তিত্ব কোনো শহরে বা উন্নত জনপদে নেই। দক্ষিণ ও উত্তর ২৪পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবনসম্পৃক্ত অরণ্যদেবী হলেন বনবিবি। জঙ্গল নির্ভর জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট জেলে, মৌলে, কাঠুরে, মাঝি-মাল্লা, বাউলে বা জঙ্গল হাসিল করা গৃহী শ্রমজীবী মানুষেরাই বনবিবির মূল পূজারী বা সেবক। বেঙ্গলটাইগার (দক্ষিণ রায়)-এর হাত থেকে রক্ষা করতেই বনবিবির বাদাবনে আগমন। 'রায়মঙ্গল' কাব্যে এমন তথ্য পাওয়া যায়। 'রায়মঙ্গলে' আছে— এক সময় আঠারো ভাটির রাজা হলেন

দক্ষিণ রায়। দক্ষিণ রায় ও বড়খাঁ গাজির মধ্যে মহাযুদ্ধে উভয়ের সন্ধি এবং উভয়ই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করতে থাকেন। পরের ইতিহাস যায় বদলে। 'বনবিবি' জহুরানামায়' নারায়ণীর বশ্যতা স্বীকারের দ্বারা দক্ষিণ রায়ের পরাজয় এবং সবার উপরে বনবিবির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে, বাদারাজ্যের সর্বময়ী অধিশ্বরী হয়ে প্রত্যেকের সীমানা নির্দিষ্ট করে দিলেন— 'কেঁদোখালি দিল বিবি দক্ষিণ রায়েরে'। বাদারাজ্যের সর্বময়ী হয়েও বাঙালিমায়ের মত সমস্ত বাদারাজ্যের বিভিন্ন অংশ প্রত্যেকের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। আর এখানেই তিনি সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের কাছে কল্যাণের প্রতিমা। বনবিবির প্রাধান্য বিষয়ে বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যবান পর্যবেক্ষণ—

> "নারায়নী ও বনবিবিতে সাতদিন লড়াই হইল। কাহারো জয় পরাজয় হয় না। ... অবশেষে সন্ধি হইয়া গেল। বনবিবি সমস্ত সুন্দরবনের বাদশাহ হইলেন। দক্ষিণ রায় আঠারো ভাটির অধিকার পাইলেন অর্থাৎ আঠারো ভাটায় যতদূর যাওয়া যায় ততদূর অধিকার পাইলেন। কিন্তু তাহাকে বনবিবির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইল। শাহজঙ্গলী এবং অন্যান্য পীরেরা বনবিবির অধীনে সুন্দরবনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।"[৬]

বনবিবির উৎস সম্বন্ধে গবেষকদের মতামত, তর্ক-বিতর্ক অতীতে যেমন ছিল— বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতে থাকবেও। আগামী দিনে হয়তো আঠারো ভাটির মাকে নিয়ে অনেক নতুন তথ্য উঠে আসবে, খুলে যাবে অনেক নতুন দরজা, তবে গবেষকদের মতামত পর্যবেক্ষণ করে একথা নিশ্চিত হওয়া যায়, প্রকৃত পক্ষে আঠারো ভাটির মা হলেন হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমন্বিত এক লৌকিক অরণ্যদেবী। বনবিবিচরিত্র বিশ্লেষণ করলে একথা আরও একবার স্পষ্ট হয়— সমগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্ন ভেদাভেদের উর্ধ্বে তিনি মমতাময়ী, কল্যাণময়ী, সাম্যবাদের প্রতীক, সুচেতনার আরাধ্যময়ী এক মানসপ্রতিমা। আশ্চর্যের বিষয়, মুসলমানের মধ্যে সাধারণত মূর্তিপূজার চল নেই, কিন্তু সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দ্বারাই বনবিবির মূর্তি পূজিত হয়। গবেষক সুজিত সুর এ প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান কথা বলেন—

> "মূর্তিপূজা ইসলামে নিষিদ্ধ। কিন্তু বনবিবির মূর্তিপূজা ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে এবং মুসলমানেরাও এই মূর্তিপূজা করেন বলেও কেউ কেউ সাক্ষ্য দিয়েছেন।"[৭]

এভাবে বনবিবি হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির ভাবনার রসে জারিত লৌকিক ভাবধারার অরণ্যানী অরণ্যদেবী।

৪

সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের কাছে এই অরণ্যসুন্দরী অরণ্যানীর পূজার কোনো দিনক্ষণ বা তিথি নেই। তবে তিনি যে রক্ষয়িত্রী, তাই বনে যাওয়ার দিন বা প্রধান মাসগুলিতে যে কোন দিনে পূজা হয়। হিঙ্গলগঞ্জ থানার কালীতলা গ্রামবাসীরা সাধারণত 'মাঘ' মাসে 'বনবিবি'র পূজা করে থাকে। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়। মৌলে বা কাঠুরিয়ারা যখন জঙ্গলে যায় তখন কাঠকাটা শুরুর আগেই মায়ের পূজা দিয়েই তবে কাঠকাটতে আরম্ভ করে। জেলে-মৌলে-বাউলেরা জঙ্গলে মাছ-মধু সংগ্রহ করতে যাওয়ার পূর্বে যেমন বনবিবির পূজা করে তেমনি মহল থেকে ফিরে এসেও মায়ের পূজা করে থাকে। আবার নিত্য পূজারও প্রচলন আছে বহু জায়গায়। অনেক জাগায় বাৎসরিক পূজাপদ্ধতি চালু আছে। এই বাৎসরিক পূজা কোথাও বৈশাখ মাসে, কোথাও পৌষসংক্রান্তিতে আবার কোথাও মাঘ মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

মা বনবিবি দেখতে কেমন? তাঁর বেশভূষাই বা কি? আসলে মুসলমান প্রধান অঞ্চলে বনবিবি অনেকটা খানদানী মুসলমান ঘরের কিশোরী বালিকার ন্যায়। মাথায় বিনুনি করা চুল, গলায় নানা রকম হার, বনফুলের মালা, পরনে পিরান বা ঘাঘরা পাজামা, পায়ে জুতো, মোজা, গায়ে পাতলা ওড়না। বাহন মুরগি অথবা বাঘ। কোলের বালক-মূর্তিটি দুখের। তবে হিন্দু প্রধান অঞ্চলে বনবিবির আকৃতি একটু অন্যরূপ। গায়ের রং হরিদ্রা, মাথায় মুকুট, গলায় হার ও বনফুলের মালা। মুসলিমদের মত হস্তে 'আশাবাড়ি' বা ঝাণ্ডা নেই। বাহন বাঘই। কোলে দুখে— অনেকটা মহামায়ার আদলটি হিন্দু বনবিবির ক্ষেত্রে চোখে পড়ে। সুন্দরবন অঞ্চলে হিন্দু বনবিবির পাশে শাহজঙ্গলীকে কার্তিকের মতো দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রায়শ দেখতে পাওয়া যায়। গাজী পটের বনবিবি চতুর্ভূজা, তবে সুন্দরবন অঞ্চলে বেশিরভাগ বনদেবীর মূর্তিতে দুটি হাত পরিলক্ষিত হয়।

সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলে বনবিবির থান বট, অশ্বত্থ, বেল প্রভৃতি গাছের তলে হয়ে থাকে। হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণির মানুষ এই সমস্ত গাছকে দেবতা জ্ঞান করে ছেদন করে না। নদীর তীরে বেশি থান দেখা যায়। বনবিবির মন্দির হয় জঙ্গলের মধ্যে, লোকালয়ে সর্বসাধারণের জায়গায়। জঙ্গলের হেঁতাল, সুন্দরী, হোগলা এবং ধানগাছের খড় মন্দির নির্মানের প্রধান উপকরণ। দূর থেকে মন্দিরকে দেখতে অনেকটা কুঁড়ে ঘরের মতো মনে হয়।

হিন্দু মতে বনবিবি পূজায় কোনও ব্রাহ্মণ নেই। বনবিবির পুরুষ ভক্তরাই মায়ের পূজারী। মন্ত্র বলতে হিন্দু-মুসলিম উভয়েই 'বনবিবির জহুরনামা' পাঠ করেন নিজেদের মতো করে। পূজায় উপকরণ খুবই সামান্য। মায়ের মূর্তির সামনে আমের পল্লব যুক্ত লাল সিঁদুর লেপা ঘট বসিয়ে প্রদীপ ও ধূপ জ্বালিয়ে, নৈবেদ্য ফল-বাতাসা-কাঁচাপাকা

শিরনি দেওয়া হয়। নিরামিষ নৈবেদ্যে দেবীর পূজা এই অঞ্চলে বাঞ্ছনীয়।

বনবিবির পূজোপলক্ষ্যে 'দুখে যাত্রা', 'বনবিবির' যাত্রা ও গান পরিবেশন হতে দেখা যায়। 'হাজত-ক্ষয়রাত' বলে একটি রীতি মউলে-বাউলে-কাঠুরিয়াদের মধ্যে প্রচলিত আছে। আসলে গ্রাম্য লোকসাধারণ তো লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কারে ভর করে ভয়ঙ্কর অরণ্যে যাত্রা করে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে। তাই দেবী অথবা বাহনের উদ্দেশ্যে বনবিবি পূজোপলক্ষ্যে জঙ্গলের মধ্যে জীবন্ত মোরগ ছেড়ে দেয়। একেই আঞ্চলিক ভাষায় 'হাজত-ক্ষয়রাত' বলা হয়ে থাকে। এজন্য গভীর জঙ্গলে অনেক উৎসর্গীকৃত বনমোরগ বিচরণ করতে দেখা যায়। এ সঙ্গে এটিও বলে রাখা দরকার— বনবিবি পূজায় কিন্তু 'বলি' হয় না। আসলে 'মা' যে নিরামিষি এবং অবশ্যই সন্তান বাৎসল্যরসের মানসিকতায় পুষ্ট দেবী। একারণে মায়ের সন্তানেরা কেউই জঙ্গলেব মুরগী ধরে না বা হত্যা করে না।

৫

দুখে যাত্রা : লোকনাট্য

সুন্দরবন অঞ্চলকেন্দ্রিক প্রচলিত পালাগান লোকসাহিত্যের অন্যতম বিষয়। আবার বনবিবি সাহিত্যের অন্যতম ধারা। প্রচলিত পালাগানের অন্যতম বিষয় হল যাত্রা, নাট্যগীতি, গীতিনাট্য এবং অবশ্যই গাননির্ভর 'একানিপালা'। তবে যাত্রা, নাট্যগীতি বা গীতিনাট্য যা হোক না কেন তা পরিবেশনকালে দেখা যায় মিশ্র-সংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস সব কিছুকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসেবে হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত 'দুখে যাত্রা'র কথা ধরা যাক।

দুখেযাত্রা = বন্দনা (বিশ্বাস-সংস্কার) + গান (বাক) + যাত্রাভিনয় (অঙ্গ-ভঙ্গি) + বাদ্যযন্ত্র বা মঞ্চ সজ্জার উপকরণ (বস্তু)।

উপর্যুক্ত ছক থেকে এটি প্রমাণিত হয় লোকযাত্রা বা লোকনাট্য শুধুমাত্র অঙ্গ-ভঙ্গ কেন্দ্রিক অভিনয় বা গাননির্ভর নয়। কোনো ধারাই এককভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে না। কারণ, প্রকাশের ক্ষেত্রে বস্তু (বাদ্যযন্ত্র/মঞ্চ সজ্জা), অঙ্গ-ভঙ্গি, বিশ্বাস-সংস্কার সবকিছুকে নিয়েই পরিপূর্ণতা লাভ করে। লোকসমাজ তো আর পৃথক-পৃথক ভাবে জীবনযাপন করে না, তাই এই পারস্পরিক সংযোগ। আর এখানেই 'দুখেযাত্রা'-র সামাজিক ও সাহিত্যিক ভিত্তি। এভাবেই বনবিবির 'একানিপালা'; 'বনবিবির পালা' লোকসংস্কৃতির বিচারে কোথাও যেন পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। শুধু বাহ্যিক বর্ণনার্থে কোনোটা বেশি গান নির্ভর (যেমন— দক্ষিণ ২৪পরগনার বনবিবির পালা), কোনোটা সংলাপ ও গান (উঃ ২৪পরগনা দুখে যাত্রা) আবার কোনোটা কথায় ও গানে কাহিনি বর্ণনা (একানিপালা, দঃ ২৪পরগনার ক্যানিং)। এখন রেখচিত্রের সাহায্যে আমরা

'দুখে যাত্রা'র সঙ্গে দঃ ২৪পরগনার 'বনবিবির পালা' ও 'একানিপালা'র মৌলিক পার্থক্য ধরার চেষ্টা করছি।

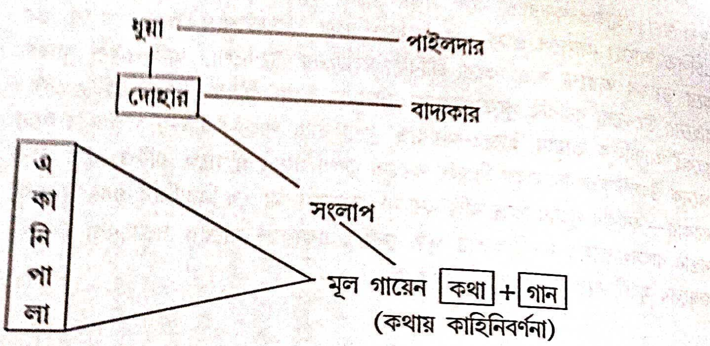

বনবিবির 'একানিপালা'র গঠনগত রেখাচিত্র: (দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং)

সুতরাং আঙ্গিকগত দিক দিয়ে একথা বলা যায়, চর্তুদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের সঙ্গে বনবিবির 'একানিপালা'র সাদৃশ্য আছে। কারণ বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও বর্ণনা ও সংলাপ নির্ভর। তাই আঙ্গিকের বিচারে এক 'নাটগীতি' মূলক কাব্য। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পরবর্তী মঙ্গলকাব্যও পাঁচালীকাব্য হিসেবে পরিচিত। দেবদেবী নির্ভর মঙ্গলকাব্যগুলি গান গেয়ে পরিবেশন করা হতো। তবে কখনো সখনও গানের সাথে বাদ্য-নাচ-অভিনয়েরও ব্যবস্থা থাকত।

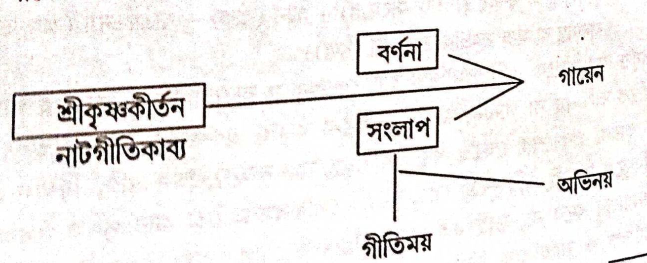

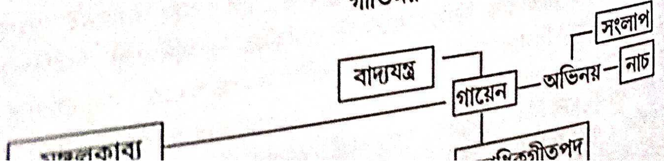

একই ভাবে মধ্যযুগের লোকগীতিকা বা পালাগানগুলি বর্ণনা ও সংলাপ সহযোগে পরিবেশন করা হতো। যেহেতু লোকগানগুলি লোককবি বর্ণনা, সংলাপ ও গীতসহযোগে পরিবেশন করতো, তাই লোকনাট্যের উপাদান পালাগানগুলিতে থাকা স্বাভাবিক। প্রসঙ্গক্রমে তাই বলতে হয়, 'একানিপালা' লোকসমাজের পালাগান হয়েও 'লোকনাট্যে'র বৈশিষ্ট্য নির্ভর। সুন্দরবন অঞ্চলের মাঠে-ঘাটে, ফাঁকা জায়গায় একজন মূল গায়েন, কতিপয় দোহার ও বাদ্যকার এবং কখনো-সখনও পাইলদারের সহযোগে পরিবেশিত হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা প্রভৃতি স্থানে কম সময়ে পাঁচ থেকে ছ'জন কলাকুশীলব সহযোগে এই পালার গীতময় অভিনয় দেখা যায়।

বনবিবির 'একানিপালা' লোকসমাজের লোকনাট্য হলেও একক গীতাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে মূল গাইনই দর্শককে আবেগে ও আনন্দে আপ্লুত করে। এরজন্য আলাদা কুশীলব খুব কম প্রয়োজন হয়। মূলগায়েন নিজেই গান এবং গানের ভাষা মর্মানুযায়ী অভিনয় করে থাকে। তবে সংকলনে 'দুখে যাত্রা' আঙ্গিকগতভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার 'একানিপালার' মত এক নয়। কারণ, 'একানিপালা' আগে গীত তারপর অভিনয়। 'দুখে যাত্রা'য় গীত অবশ্যই আছে, তবে অভিনয় মুখ্য।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি হিঙ্গলগঞ্জ থানার কালীতলা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত 'দুখে যাত্রা' অবশ্যই লোকনাট্যের শ্রেণিভুক্ত। তবে 'দুখে' ও 'যাত্রা' এই দুটি শব্দ নিয়ে একটু আলোচনা দরকার। 'দুখে'-কে নিয়ে যে লৌকিক কাহিনি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রচলিত আছে, তার উৎস নিঃসন্দেহে ইসলামি পুরাণ 'জহুরানামা' গ্রন্থ। ধনা মৌলের দুখেকে নিয়ে মহলে গমন এবং দুখের দুঃখের করুণ কাহিনি 'বনবিবি পালা' ও 'একানিপালা'র মূল আকর্ষণীয় দিক বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। তাই সুন্দরবন অঞ্চলকেন্দ্রিক লোক সাধারণের কাছে মা বনবিবির আঠারো ভাটির দেশে আগমন ও মাহাত্ম্য প্রচার যতটা না গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দুখের দুঃখের করুণ কাহিনি ও মা বনবিবির কৃপায় দুখে ও দুখের মায়ের মুক্তিলাভ। তাই পালাকাররা ব্যস্তময় জীবনে সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে 'বনবিবি পালা'র সম্পূর্ণ অংশ অর্ধশিক্ষিত - অল্পশিক্ষিত - নিরক্ষর মানুষগুলির সামনে তুলে না ধরে; শুধুমাত্র দুখের ও ধনা মৌলের বিশেষ অংশটি সংলাপ ও গীতসহ পরিবেশন করেন। তবে দক্ষিণ ২৪পরগনার কোথাও কোথাও সারারাত ধরে 'বনবিবি পালা'র গীতাভিনয় লক্ষ্য করা যায়। এখন দুখের করুণ কাহিনি কিভাবে যাত্রা হয়ে গেল দেখে নেওয়া যাক। হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত দুখের কাহিনি যেহেতু লৌকিক, তবুও এই কাহিনিতে নাটকীয় উপাদান অন্যান্য পালাগুলির থেকে অনেক বেশি। তাই দুখের কাহিনিতে সংলাপের যথাযোগ্য ব্যবহার ও নাটকীয়তার গুনে 'যাত্রা' বলাই সংগত। কারণ, যাত্রারমত অংকসহ দৃশ্যবিভাজন, চরিত্রানুযায়ী সংলাপ, চরিত্রের যাত্রার মত মুখস্থ সংলাপ বলার দক্ষতা,

নাচ, গান, বাদ্য-বাদক ইত্যাদি আধুনিক নাটকের প্রায় সমস্ত উপাদান লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে শিল্পী ও কলাকুশীলবদের কাছে এটি বড় আকারের দলগত পরিবেশনা। যার গঠনগত বৈচিত্র্য অন্য পালা গুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক :

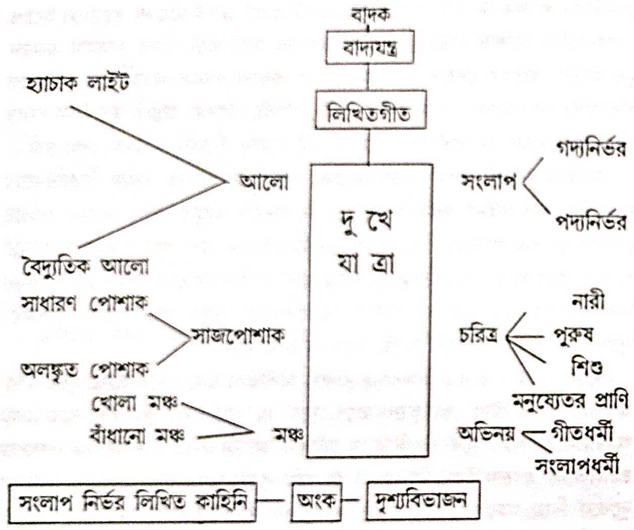

হিংগলগঞ্জ থানার অন্তর্গত কালীতলা অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত 'দুখে যাত্রা'র গঠনকৌশল

গঠনকৌলের বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কালীতলা অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত 'দুখে যাত্রা' পালাটিকে যাত্রা বলাই সংগত। যাত্রার প্রায় সমস্ত গুণই বর্তমান। দলে পেশাদার শিল্পীরা থাকে; লিখিত রূপ বর্তমানে কলাকুশীলবদের ঘরে মেলে। সংলাপ প্রায় মুখস্থ বলে। বিবিমাহাত্ম্য মূল লক্ষ্য হলেও লোকমনোরঞ্জনই বর্তমান পালাকারদের মূল উদ্দেশ্য। সময়ের দাবি মেটাতে মূল কাহিনির গ্রহণ বর্জন হয়েই থাকে। কাহিনির বিষয় বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক সময় আধুনিক সংগীতও অভিনয়ের মাঝে মাঝে শিল্পীদের কণ্ঠে গীত হতে দেখা যায়। আধুনিক যাত্রা পালার মত সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে '৩' থেকে '৪' ঘন্টার মধ্যে কাহিনি সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে নারীচরিত্রে নারীরাই অভিনয় করে। তবে লোকনাট্যের মত একই

শিল্পীর একের অধিক চরিত্রে অভিনয় করার চলও আছে।

৬

ভাষা :

উত্তর ২৪ পরগনায় হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত কালীতলা অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত 'দুখে যাত্রা' পালাটির একটা আলাদা ভাষাগত বৈচিত্র্য আছে। এই নিজস্বতা সুন্দরবন অঞ্চলের আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যে যেমন পুষ্ট, তেমনি উত্তর ২৪ পরগনার কথ্য ভাষার আলোকে আলোকিত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার 'একানিপালা' বা 'বনবিবির পালা' যতটা না কাব্যিকতায় পুষ্ট, উত্তর ২৪ পরগনার 'দুখে যাত্রা' পালাটি ততটাই মান্যচলিত ভাষায় জারিত। এখানে সংলাপের ভাষা স্থানীয়ভাবে সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শায়িত রূপ।

সুন্দরবন পৃথিবীর বিস্ময়। সুন্দরবনের রহস্যময় বন্যপ্রকৃতিকে স্ব-চক্ষে দেখার জন্য ছুটে আসেন সৌন্দর্যপিপাসু বহু মানুষ। কিন্তু আলোর নিচে অন্ধকারের মত এই সৌন্দর্য ও রহস্যমণ্ডিত প্রকৃতির কোলে লালিত মানুষগুলির মুখের বুলি ও জীবনচর্চা প্রায় থেকে যায় অবহেলিত। নদীবক্ষে মাছ ধরা, নদীকূলে চিংড়ি পোনা সংগ্রহ করা, জঙ্গলে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে কাঠ ও মধু সংগ্রহ করা এবং কৃষিকাজ এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা। জঙ্গলে মধু সংগ্রহকেন্দ্রিক জীবিকানির্ভর লোকনাটকই হলো 'দুখে যাত্রা'।

আজ থেকে অনেক বছর আগে সুন্দরবনের কথ্য ভাষার বৈচিত্র্যকে লক্ষ্য করে 'যশোর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক ও সুন্দরবন গবেষক সতীশচন্দ্র মিত্র মন্তব্য করেন—

> "সকল জেলার ন্যায় সুন্দরবনের ভাষারও একটা প্রাদেশিকতা আছে। এই প্রাদেশিকতার সহিত নিকটবর্তী কয়েকটি জেলারও ভাষাগত সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুন্দরবনের এই মিশ্রিত ভাষাকে আমরা 'জঙ্গলা' ভাষা বলিতে পারি।"

সতীশচন্দ্র মিত্রের অবিধা— 'জঙ্গলা' ভাষা সূত্র ধরেই আলোচ্য লোকনাটকের ভাষাগত বৈচিত্র্যের সন্ধান করা যেতে পারে। তবে শুধুমাত্র 'জঙ্গলা' ভাষা দিয়ে নাটকের সংলাপ গঠিত হয়েছে এমনটি নয়। চরিত্রানুযায়ী ভাষার বিবর্তন লক্ষ্য করার মত। মাঝি-মাল্লার চরিত্রে যেমন 'বঙ্গালী' উপভাষার টান আবার বনবিবি, শাহজঙ্গলী চরিত্রে কাব্যিক ভাষার প্রয়োগ, কখনো কখনো মান্যচলিত ও কাব্যিক ভাষার মিশ্রণে ধনা মৌলের স্বভাববৈচিত্র্য ও দক্ষিণ রায়ের উগ্রতা প্রকাশিত। কখনো সখনো মাঝি-মাল্লার কণ্ঠে 'সুন্দরীভাষা'র প্রয়োগ চরিত্র গুলিকে অন্য মাত্রা দান করেছে।

আলোচ্য সংকলন পালাটির ভাষাগত বৈচিত্র্যসন্ধান করতে হবে এই অঞ্চলের

সামাজিক ইতিহাসের উত্থান-পতন, আঞ্চলিক মানুষের জীবিকা, লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতির আলোকে। কারণ এই সমস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভাষাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

আমরা দেখেছি সুন্দরবনকেন্দ্রিক সমাজ জীবন, জনবিন্যাস, এখানকার জনবসতির মধ্যে একটা পৃথক স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। ভৌগোলিক ও জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় নানা মানুষ এখানে এসেছে এবং নতুন করে বসতি স্থাপন করে বাসস্থান গড়ে তুলেছে। বাদাবন পরিষ্কার করে কোম্পানীর আমলে এখানে ভূমিবন্টন ও জনবসতির কাজ একসময় শুরু হয়। সেই সময় থেকে সুন্দরবনের নানা প্রান্তীয় অঞ্চলে নানান জনস্রোত এসে মিলিত হয়। আবার নতুনভাবে জনবসতির সুযোগ নিতে উত্তরের সন্নিহিত জেলা থেকে কাতারে কাতারে অসংখ্য মানুষ সুন্দরবন অঞ্চলে এসে বাস করতে শুরু করে। এছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত থেকে হাজার-হাজার বানভাসি পরিবার নানা সময় 'সুন্দরবনে' এসে আশ্রয় নেয়। এছাড়া সাওতাল, মুন্ডা, ওরাও, ভূমিজ প্রমুখ উপজাতির মানুষ সুন্দরবনে আসে। আর স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু স্রোত সুন্দরবনের জনজীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। সুতরাং নানা অঞ্চলের কথ্যরীতি, আঞ্চলিক শব্দপ্রয়োগে এখানকার কথ্য ভাষা মিশ্রভাষায় পরিণত হয়। তাই সুন্দরবনকেন্দ্রিক সাহিত্য 'বনবিবির পালা' বা 'দুখে যাত্রা' আঞ্চলিক কথ্য ভাষার প্রয়োগে সংলাপ অন্যমাত্রা দান করে। সংলাপে জেলে-মাঝিদের মুখে প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফারসী-উর্দু শব্দের প্রয়োগ হলেও 'দুখে যাত্রা'র ভাষা মূলত উত্তর ২৪ পরগনার মান্যচলিত ভাষা।

আরও একটি বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে লক্ষণীয়, সুন্দরবনের সমাজ মূলত নিম্নবর্গের মানুষের সমাজ। যে সমাজের বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে। উত্তর ২৪পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত 'দুখে যাত্রা'র বেশিরভাগ পাত্র-পাত্রী, অভিনেতারা দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। সুতরাং তাদের মুখের সংলাপ শহরের মান্যচলিত ভাষা থেকে একটু পৃথক হবে এটাই স্বাভাবিক।

দুখে যাত্রা : ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য

'দুখে যাত্রা' পালাটি যেহেতু সুন্দরবন অঞ্চলকেন্দ্রিক পালাগান বা আঞ্চলিক নাটক, তাই নাটকের ভাষাগত ধ্বনিবৈচিত্র্যকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে গেলে 'ধ্বনিতাত্ত্বিক' বিশেষত্ব দিয়েই আঞ্চলিক লোকযাত্রাকে সহজে চিনে ফেলা যাবে। সুন্দরবনের জল-জঙ্গলময় জীবন পরিবেশে জেলে-মউলে-বাউলে, মাঝি-মাল্লাদের মধ্যে অথবা সাধারণ মানুষের ভীড়ে কান পাতলেই নাটকের ভাষার অভিনবত্ব আমাদের চোখে পড়বে। কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল-র মান্য বাংলা ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকে পাশাপাশি

রাখলে সুন্দরবন অঞ্চলকেন্দ্রিক লোকগানের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অভিনবত্ব স্পষ্ট হবে।

ক। স্বরধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য :

অ>উ (চটে > চুটে) — 'লোকজন সব চুটে উঠেছে।' (মনোহর)

এ>অ্যা (কেন> ক্যান) — 'তোরা গন্ডোগোল করিস্ ক্যান।'

ধনার নৌকার মাঝি-মাল্লাদের কণ্ঠে পূর্ববাংলার 'বঙ্গালী' উপভাষার প্রয়োগ চোখে পড়ার মতো। যথা—

"এই আলার পো ব্যাটা আলারা। তোরা সব কি নিয়া গন্ডোগোল করচিস্। মোদের বাড়ীতে একটা ভদ্দর লোক আইচে।" (সাধু)

এখানে,

এসেছে>আইচে (অপিনিহিতি)

বেটা>ব্যাটা (এ>অ্যা)

নিয়ে>নিয়া (এ>আ), তিনটে>তিনটা

ও>আ (বুড়ো>বুড়া)

'বুরা বয়সে তোর টাহা বাক করা দেহিয়ে দিই'

অ>উ (দেব>দিমু)

এ>ই (দেব>দিমু)

খ। ব্যঞ্জনধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য:

ক> হ [টাহায় বাহের দুধ মেলে বুঝলে টাহায় বাহের দুধ মেলে]— মহাপ্রাণতা, শব্দমধ্যস্থ একক অল্পপ্রাণবর্ণলোপ, 'হ' ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমন।

মূর্খ>মুক্ক [সমীভবন]

এমনভাবে>এমমায় [সমীভবন] 'এই সব গন্ডমুক্কু নিয়ে আমাকে বাদায় যেতে হবে'।

আধ্লা>আল্লা [সমীভবন]

ভাই>বাই (অল্পপ্রাণীভবন) 'ও মনোহর বাই কত কি দেবেন কহেন তো দেহি।'

করছিস > করচিস্ (অল্পপ্রাণীভবন) 'তোরা গন্ডোগোল করচিস্ ক্যান'।

ড়>র ('তুই এহানে খারা হয়ে দারা')

খাড়া>খারা

দাঁড়া>দারা

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নৌকার মাঝি-মাল্লাদের সংলাপে পূর্ববাংলার বঙ্গালী ভাষারটান লক্ষণীয়। তবে মান্যচলিত ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও প্রধান চরিত্রগুলির সংলাপে প্রাধান্য পায়।

দুখে যাত্রা : রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

ক। সর্বনাম পদের ব্যবহার: মান্যচালিত ভাষার রূপকে সামনে রেখে আলোচ্য নাটক থেকে সর্বনাম পদের রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যেতে পারে। যেমন—

মান্যচালিত>কথ্যরূপ	কথ্যভাষা/দুখেযাত্রা
আমাকে>মোকে	'হালাদিমু মোকে আসতে দে'
ওখানে>ওহানে	'ঐ ওহানে সাধুবাইরে-ঐ ওহানে'
একটা>এট্টা	'ঠিক এট্টা খাইছে'।

খ। ক্রিয়া-বিশেষণ :

'দুখে যাত্রা'য় এমন কিছু ক্রিয়া-বিশেষণ পাওয়া যায়, যা সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি। যেমন—

মান্যচলিত		লোকভাষা	দুখে যাত্রায় প্রয়োগ
শীঘ্র এসো	>	খরখর	'ওরে ওঠনা ভাই। ধনা ভাই খরখর আইলো।'

গ। শব্দার্থগত ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

প্রত্যেক ভাষায় শব্দার্থতত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুন্দরবন অঞ্চলকেন্দ্রিক পালাগান 'দুখে যাত্রা'য় শব্দার্থ পরিবর্তনের বিষয়টি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ, এখানকার মানুষের নিজস্ব সামাজিক পরিবেশ, জীবনযাত্রা, জীবিকার্জনের কঠিন সংগ্রাম বিশ্বাস-সংস্কার, ভৌগোলিক পরিবেশ প্রভৃতির প্রভাবে মান্যচলিত শব্দ তার খোলস ত্যাগ করে একেবারে নিজস্ব পারিবারিক বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে।

এখানকার অধিকাংশ মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ, নদীতে পিন্ বাগদা সংগ্রহ, মাছধরা ও জঙ্গলে কাঠ-মধু সংগ্রহ। তাই এখানকার জেলে-মৌলে-বাউলে-কাঠুরিয়াদের পদে পদে বিপদের হাতছানি। কিন্তু বিপদের ভয়ে মৃত্যু চিন্তা করে ঘরে বসে থাকলে তো আর পেট চলে না, তাই মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে বিশ্বাস-সংস্কারের উপর নির্ভর করে জল-জঙ্গলে ছুটে চলে জীবিকার্জনের জন্য। এ সমস্ত কারণে এখানকার মানুষের বাগব্যবহারের বিশ্বাস-সংস্কারজাত বাচনিক নিষিদ্ধতা ও সুভাষনের অধিকার লক্ষ্য করা যায়। তাই অমঙ্গল বা মৃত্যুভয় আছে এমন নেতিবাচক শব্দকে সাধারণ মানুষ মুখে উচ্চারণ না করে অন্যকোন শব্দ দিয়ে নেতিবাচকতাকে প্রকাশ করতে চায়। শব্দার্থ পরিবর্তনের এই নিয়মই হচ্ছে 'সুভাষণ'। নাটকে সুভাষণের প্রয়োগ বৈচিত্র্য এরকম—

মান্যচলিত ভাষা—	কথ্যভাষা
রক্ত	আটা
বাঘ	বড়মিঞা/মামা

আলোচ্য নাটকে 'সুভাষণে'র এই রীতি মেনে জেলে-মউলেদের সংলাপে 'বাঘ' শব্দের প্রয়োগ হয়নি এমন নয়, মাঝি-মাল্লাদের সংলাপেও 'বাঘ' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

রহিম = "আরে এ সাধু বাই— সাধু বাইরে
আমার সাতশ বাহে তাড়া করছে।"

ধোনা মউলের মাঝি-মাল্লারা 'সুভাষণ' রীতিকে এক্ষেত্রে প্রাধান্য যেমন দিইনি, তেমনি দুখের সংলাপেও 'বাঘ' শব্দের প্রয়োগ চোখে পড়ে। আসলে দক্ষিণ রায়ের মত নর-মাংসলোভী দেবতাকে এখানে অস্বীকার এবং বনবিবির মাহাত্ম্য প্রচার আলোচ্য নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

দুখে = "যেওনা, যেওনা ভাই, এই বিপদ কালে
আমাকে রক্ষা করো, অভয়দাও, ওকি? ওইতো বাঘের
গর্জন।"

ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে একথা বলা যায়, উত্তর ২৪পরগনার মান্যচলিত ভাষায় নাটকের প্রধান প্রধান চরিত্রসংলাপ নির্মিত, আবার অল্প শিক্ষিত মাঝি-মাল্লাদের সংলাপে ওপার বাংলার কথ্য ভাষার প্রয়োগ বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেব-দেবী নির্ভর চরিত্রগুলি কাব্যিক ভাষা প্রয়োগে আলাদা মাত্রা লাভ করে।

উত্তর ২৪ পরগনার মান্যচলিত ভাষার নিদর্শন:

i) "না-না আমি পারবো না। নৌকায় তো অনেক লোক আছে। তাদের বলো। চা-চা আমি বনে যেতে পারবোনা।" (দুখে/চতুর্থ অংক/১ম দৃশ্য)

ii) "শুনো মাঝি ভাই। আমি তোমাদের কাছে কিছু গোপন রাখবো না। সেই বীরপুরুষ তার নাম দক্ষিণ রায়, সে চায় একটা কর।" (ধোনা/দ্বিতীয় অংক/৫ম দৃশ্য)

বঙ্গালী ভাষার প্রয়োগ :

"এই আলগজ এদিহে শোন শোন। এদের কি কবু কহেন তো দেহি। এইসব গন্ডমুক্কু নিয়ে আমাকে বাদায় যেতে হবে?" (২য় অংক/১ম দৃশ্য/সাধু)

কাব্যিক ভাষার নির্দশন :

কাব্যিক ভাষার প্রয়োগ-এ সাধু ও চলিত শব্দের মিশ্রণ বেশ চোখে পড়ে। যেমন—

"আমি চলিলাম ভগ্নি। দেখি কেমন সে মায়াবী, আমাদের অধিকারে করে অত্যাচার। তন্নতন্ন করে খুঁজিব পর্বত কন্দর। নাহি পাবে পরিত্রাণ, আজ জঙ্গলী-রুধিলে নাহি পাবে পালাইবার স্থান। জংগুলী সলিলে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ি বাহির হইবে প্রাণ— জংগুলি জ্বলিলো আজ পর্বত সমান। পবনের গতিসমো ধাইলাম তবে। পাশবি কানন মাঝে শুধু মার মার রবে।" (জঙ্গুলী/৩য় অংক/ ১ম দৃশ্য)

সব মিলিয়ে বলা যায় গ্রাম্য লোকসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে 'দুখে যাত্রা' পালাটির ভাষাবয়ব নির্মিত হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের অর্ধশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত মানুষ সাধুগদ্য পাঠে অভ্যস্ত নয়। তাই সংলাপে সীমিত সাধুগদ্যের পাশা-পাশি চলিত গদ্যের প্রয়োগই প্রাধান্য লাভ করে। আসলে, নাটক বা যাত্রায় সাধুগদ্যময় সংলাপ-র ব্যবহার দর্শককে ততটা কাছে টানতে পারে না, সংলাপে চলিতগদ্য রীতি প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে দর্শক ও অভিনেতা আরও বেশী কাছাকাছি অবস্থান করতে পারে। অবশ্য সংলাপে মৌখিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সীমারেখা থাকা দরকার। কারণ মান্যচলিত ভাষার পরিবর্তে অতিরিক্ত আঞ্চলিক উপভাষা দর্শককে রসাস্বাদনে কিছুটা বিঘ্ন ঘটাতে পারে। এজন্য শুধুমাত্র মাঝি-মাল্লাদের সংলাপে 'বঙ্গালী' উপভাষার প্রাধান্য থাকলেও 'বনবিবি', 'জঙ্গুলী', 'দক্ষিণারায়'-র মত চরিত্রে মান্যচলিত ভাষার প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাধু এবং চলিত ও আঞ্চলিক উপভাষার মিশ্রণে 'দুখে যাত্রা'র সংলাপ ও ভাষার জগৎ এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যাতে চরিত্রগুলিও জীবন্ত অথচ স্বতন্ত্র হয়ে সামাজিক মানুষ হিসাবে স্বাভাবিক ও সচল রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আমাদের আলোচ্য 'দুখে যাত্রা'কে আঞ্চলিক যাত্রা বা লোকনাট্য বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ভাষাবিচারে নাটকটিকে পুরোপুরি আঞ্চলিক বলা যাবে না। কারণ, সমাজতাত্ত্বিকভাবে 'দুখে যাত্রা'কে 'সামাজিক-আঞ্চলিক' নাটকও বলা যেতে পারে। তাই 'সামাজিক-আঞ্চলিক, সব মিলিয়ে প্রকরণটির ভাষাবৈচিত্র্য সত্যিই স্বাতন্ত্র্যতার দাবি রাখে।

উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত কালীতলা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত 'দুখে-যাত্রা'য় ব্যবহৃত ভাষার প্রকারভেদ একটি ছকের সাহায্যে স্পষ্ট করা যেতে পারে—

'দুখে যাত্রায়' ব্যবহৃত ভাষার প্রকারভেদ

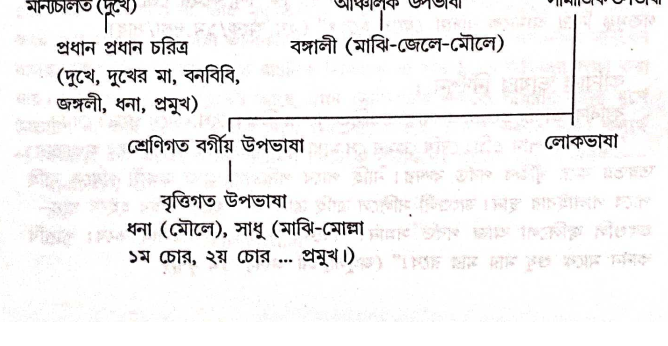

শব্দভাণ্ডার :

সাধু-চলিত ও আঞ্চলিক কথ্যভাষার প্রয়োগে লোকনাট্যের সংলাপ বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপলাভ করেছে। সাধু-চলিত ও কথ্যভাষার সব রীতিতেই তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, বিদেশী শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। আলোচ্য নাটকে দেব-দেবীর মুখে তৎসম, তদ্ভব শব্দের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ-র মুখে দেশি-বিদেশী, অর্ধতৎসম, তদ্ভব শব্দের প্রাধান্য বেশি লক্ষ্য করা যায়। আবার জেলে-বাউলে-মৌলেদের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার মধ্যে পেশাভিত্তিক বৈচিত্র্যময় শব্দকোষের পরিচয় পাওয়া যায়। যা নাটকের শব্দভাণ্ডারকে আলাদামাত্রা দান করে। এরকম কিছু পেশাভিত্তিক শব্দের উদাহরণ নাটক থেকে তুলে ধরা হল। যথা—

শব্দ	অর্থ	নাট্যপ্রয়োগ
ছাটা	মধুসংগ্রহ করা	'নে-নে-নে ছাটা ধর'
আড়ি	মধুরাখার পাত্র	'ধর ধর শক্ত করে আড়ি ধর'
মহল	জঙ্গল	'মহল করিতে যায় ধনা'
সাজনি	মহাজন	আমাগো দলে সাজনি কেরা?
সাঁই	যারা জঙ্গলে যাত্রা করে	

এছাড়াও আরবি ও ফারসী শব্দের প্রয়োগেও নাটকে ব্যবহৃত শব্দ আলাদা মাত্রা লাভ করেছে। মুসলিম মাঝিদের সংলাপে আরবি ও ফারসী শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

বাদা (জঙ্গল) < বাদিয— আরবি শব্দ

নাটকে প্রয়োগ : 'বাদায় যাওয়ার লোক হচ্ছিলো না।'

সংলাপ :

সংলাপ নাটক বা যাত্রাপালায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাটক বা পালাগানে সংলাপের কাজ বহুমাত্রিক। একটি চরিত্রের সঙ্গে অপর চরিত্রের মনের ভাব আদান-প্রদান, চরিত্রের অন্তরঙ্গকে ফুটিয়ে তোলা, অনেক সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা বা ইঙ্গিত দেওয়া। নাটকের বক্তব্যকে চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করা। আবার কখনো কখনো সংলাপের ভাষার মধ্যে আঞ্চলিকতার প্রয়োগে নাটকটিকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের রসে জারিত করা ইত্যাদি। সংলাপের এই কার্যকারিতার কথা মাথায় রেখে ক্লীন্থ, ব্রুক্স এবং রবার্ট বি হেইলম্যান সার্থক সংলাপের কতগুলি লক্ষণকে চিহ্নিত করেছেন। যথা—

ক।। অগ্রসরণ,

খ।। ঔচিত্য,

গ।। সূচনা,
ঘ।। স্বাভাবিকতা,
ঙ।। তথ্যের উপস্থাপন,
চ।। গতিবেগ।

এসব কারণেই সমালোচকের কথা মাথায় রেখে বলতে হয় "Dialogue is the soul of Drama"

আমাদের আলোচ্য 'দুখে যাত্রা' যেহেতু একটি আঞ্চলিক নাটক, তাই একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষা ব্যবহৃত হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে শুধু আঞ্চলিক ভাষায় এই লোকনাটকের সংলাপ পূর্ণতা পায়নি, পাশাপাশি চরিত্রানুযায়ী সাধু ও মান্যচলিত ভাষার প্রয়োগ সংলাপকে বিচিত্র মুখি করে তুলেছে। আবার 'বঙ্গালি' উপভাষার ভাষা-ভঙ্গি সংলাপকে দিয়েছে আলাদা মাত্রা। তাই নৌকায় মাঝি-মাল্লাদের চরিত্রে 'বঙ্গালী' উপভাষার টান যেমন আছে তেমনি সুন্দরবন অঞ্চলের নিজস্ব কথ্য ভাষার প্রয়োগও সংলাপে ভিন্ন মাত্রা আনে। এখন নাটক থেকে কিছু উদাহরণের সাহায্যে সংলাপে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষার প্রয়োগ দেখে নেব। যথা—

ক।। "বৃক্ষের পাতায় পাতায় থাকিবে নাম
উজ্জ্বল লেখা, হ্যাঁ কাহার ঘরে লভিবো
জন্ম ভগ্নি?" [সাধু ভাষার সংলাপ]

খ।। "বিজান— বাপ দুখে, তুমি বাড়ি থাকো।
আমি যাই?
দুখে— না মা, তুমি যেওনা, ওরা হয়তো
তোমাকে মেরে ফেলবে।"
[মান্যচলিত / উত্তর ২৪ পরগনা]

গ।। "রহিম— না-না, গন্ডোগোল করবো ক্যান।
তুই এখানে খারা হয়ে দারা, বুরা
বয়সে তোর টাহা ভাগ করা দেহিয়ে
দিই।" [আঞ্চলিক কথ্যরূপ/যশোর-খুলনা]

চরিত্রের মর্যাদানুযায়ী নাটকের ভাষা সন্নিবিষ্ট হয়। আলোচ্য নাটকেও বনবিবি, জঙ্গুলী, দক্ষিণ রায় প্রমুখ দেব-দেবী নির্ভর চরিত্রের সঙ্গে নৌকায় জেলে-মাঝিদের সংলাপগত ভাষার পার্থক্য চোখের পড়ার মত। অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও নিরক্ষর জেলে-মাঝিদের সংলাপে মান্যচলিত ভাষাপেক্ষা আঞ্চলিক কথ্যভাষার প্রয়োগ হওয়াটা স্বাভাবিক। তাই নৌকায় মাঝিদের সংলাপে সুন্দরবনের কথ্যরূপ মিশ্রিত বঙ্গালীটান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। যেমন—

"তাই কতে হয়, তাই কতে হয়—
যে ওহানে লড়ছে কি? আসার সময় ঐহানে
একটা গোলের ঝাড় ছিলো না— বাতাসে সেই
গোলের ঝাড় হর-বর করছিল।"
[সাধু / নৌকার মাঝি]

আবার নাটকে দেব-দেবীর মহিমা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রকাশে পদ্যধর্মী সংলাপ-এর ব্যবহার চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। যেমন—

"বনবিবি— রহমানের হুকুমে, মর্ত্যলোকে হবে জনম
মোদের। সংসার খেলায় মানব আকারে
কত খেলাই খেলতে হবে কে জানে?
কর্মময় জগৎ, স্বার্থের কষাঘাতে মন
চায় না যেতে।"
[বনবিবি / ১ম অংক / ১ম দৃশ্য]

দেব-দেবীর মুখে শুধু কাব্যিক সংলাপ নয়, সাধু মিশ্রিত কাব্যিক ভাষার পাশাপাশি চলিত ভাষার সংলাপও প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে গ্রাম্য সাধারণ মানুষের কাছে নাটকটি বোধগম্য হয়ে উঠেছে। নাটক যত সমাপ্তির দিকে এগিয়েছে দেব-দেবীর মুখের সংলাপ ততো মাটির মানুষের কাছাকাছি পৌঁছেছে। দেব-দেবীর আচার-আচরণ হয়ে উঠেছে মানবিক। আর মানবিক ক্রিয়া-কর্মকে স্পষ্ট করেছে চলিত ভাষার সংলাপ—

"ভগ্নি— এই সেই দক্ষিণ রায়। বহু কষ্টে ওকে
ধরে এনেছি। এখন বলো কি করতে হবে"
(জংগুলী)

এভাবে যথার্থ স্থানে যথাযথ সংলাপ প্রয়োগের ফলে নাটকের স্বাভাবিক গতিবৃদ্ধি পেয়েছে। কোন মন্থরতা লোকনাটকটিকে স্পর্শ করতে পারেনি। ফলে সংলাপ পেয়েছে বৈচিত্র্যের ঠিকানা।

লোকনাট্যটির পীঠস্থান গ্রাম। অনেক চরিত্রের সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা-প্রয়োগে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। আবার সংলাপে প্রবাদ-প্রবনের ব্যবহারে গ্রাম্য সমাজ-বাস্তবতা আরও স্পষ্ট ও উজ্জ্বল।

তথ্যসূত্র:

১। ইসলামি বাংলা সাহিত্য, সুকুমার সেন, ১৪০০ (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৮) কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., পৃ. ৭৩।

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৫ম সং, এ.মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম., কলকাতা, ১৯৭০, পৃ.৭৫৩।

৩। দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণরায়, অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হরিনাভি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, অক্টোবর, ২০০৫, পৃ. ৬৪।

৪। বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, গিরীন্দ্র নাথ দাস, সুবর্ণরেখা, কলকাতা ১৯৯৮, পৃ. ১৮৯।

৫। গাজি কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুথি, আবদুর রহিম, ওসমানিয়া লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৮৩, পৃ. ১৯।

৬। পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী ও লোকবিশ্বাস, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প.ব.সরকার, কলকাতা, জুন, ২০০১, পৃ.১২৮।

৭। মাটিতে পারেখে (বনবিবি উৎস সন্ধানে ও অন্যান্য প্রবন্ধ), সুজিত সুর, পাঠশালা প্রভাকসন্স, হাওড়া, ফেব্রুয়ারী ২০১৪, পৃ.৬৩।

চাক্ষুষভাবে যে সমস্ত পাঠক দুখে যাত্রার ভিডিওকে উপলব্ধি করতে চান, তাঁদের জন্য এই লিংটি দেওয়া হল—

https://m.youtube.com/watch?
feature=youtu.be&v=-AalfUbCZe4

https://m.youtube.com/watch?
v=SNMGHznfm8l

https://m.youtube.com/watch?
v=pGBGpBB8nm4

https://m.youtube.com/watch?
v=1qzVKe09Ev8

দুখে যাত্রার বিষয়বস্তু

(হিঙ্গলগঞ্জ থানার কালীতলা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত 'দুখে যাত্রা'র সংক্ষিপ্তসার)

সুন্দরবন অঞ্চলকেন্দ্রিক 'বনবিবি পালা' গানের মধ্যে লোকনাট্যের দলগুলি জনপ্রিয়তার কারণে 'ধোনা মৌলের মহল যাত্রা বা দুখের কাহিনি এবং বোনবিবির মাহাত্ম্য প্রচার' উপস্থাপন করেন। দুখে যাত্রার এই অংশে (প্রথম অংক) বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে বেরাহিম নামে এক ফকির ও তাঁর স্ত্রীর নিঃসন্তানহীনতার যন্ত্রণা—

"পুত্রহীনের গৃহশূন্য, ফলহীন বৃক্ষ, জলহীন নদী
শষ্যহীনা বসুন্ধরা, কৈ কেউতো শোভা পায়না।"

সন্তান কামনায় তারা আল্লার দরগায় এবং রসুলের গোরে জিয়রত করেন, তারা তখন জানতে পারেন— স্বামীর দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহণ এবং ফুলবিবির বন্ধ্যত্বের দুঃখ। এই দুই মিলে 'অস্থির ফুলবিবি শেষপর্যন্ত এক শর্তে স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি দেন। ফুলবিবির সম্মতি পেয়ে একান্ত সন্তানবাসনায় বেরাহিম মক্কাশহরে জালাল ফকিরের কুমারী কন্যা গোলাল বিবিকে বিবাহ করেন।

এদিকে বনবিবি ও জঙ্গুলি ছিলেন বেহেস্তে, তাদের উপর হুকুম হয়—

"রহমানের হুকুমে, মর্ত্যালোকে হবে
জন্মমোদের" (বনবিবি, জঙ্গুলিকে)

গুলাল বিবির জঠরে খোদার আদেশ মতো বনবিবি ও জঙ্গলীকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। মর্ত্যে বেরাহিমের গোলান বিবিকে বিবাহ ও ফুলের হাতে লাঞ্ছনা এবং বনবিবি ও জঙ্গুলিকেও কত লাঞ্ছনা পেতে হবে এই নিয়ে বনবিবি চিন্তিত।

গোলাল বিবি যখন দশমাসের গর্ভবতী, ফুলবিবি সেই সময় পূর্বশর্ত স্মরণ করিয়ে দিলেন বেরাহিমকে—

'আমি চাই গুলালের বনবাস দিতে,' একথা শুনে বেরাহিম যেন আকাশ থেকে

পড়লেন এবং ফুলবিবিকে বললেন—

> "ফুল তুমি অন্য কিছু প্রার্থনা করো। অথবা আমার হৃদপিণ্ডটা
> উপড়ে নাও। আমি দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু গুলাল কে
> বনবাসে দিতে পারবো না।"

কিন্তু শেষপর্যন্ত ফুলের জেদ ও হিংসায় বেরাহিম গোলালকে বনবাসে দিতে বাধ্য হন। বনবাস কালে যথাসময়ে গোলালবিবি দুই সন্তান প্রসব করলেন। বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ক্ষুধার তাড়নায় কণ্ঠাগত প্রাণ। একে নিজে বাঁচে না, তার উপর দুটি সন্তান। যদিও এক আশ্রয় মিললো, বিধির খেলায় তাও হারালাম। তাই কারো জন্যে স্নেহ মমতা না করে এবং নিজের সন্তানরাও একদিন ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে এই অভিপ্রায় গুলালবিবি দুটি চোখ যেদিকে যায়, সেদিকে চলতে শুরু করলো। কোলের কন্যা সন্তান পড়ে রইলো মাটিতে। ঈশ্বরের আদেশে মাতৃপরিত্যক্ত বনবিবিকে বনের হরিণীরা লালন করতে থাকে, আর পুত্র শাহজঙ্গুলীকে নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ান গোলাল বিবি, এভাবেই প্রথম অঙ্কের ৫ম দৃশ্যে বনবিবিও ভাই জঙ্গুলিকে হারায়।

> "হায় খোদা ছিনু মোরা দুটি ভাইবোন
> হলাম ভাইটিহারা" (বনবিবি)

কপাল মন্দ হলে যা হয়— বনবিবিকে উদ্দেশ্য করে ভক্তমালার কণ্ঠে ভেসে ওঠে সেই সুর—

> "কপাল মন্দ হলে, বন্ধু মন্দ বলে
> সম্বন্ধ রাখেনা সহোদর ভাই।
> ... ...
> এ দুঃখ বারতা কাহারে জানাই।
> প্রতিবেশী যারা, কথা কয়না তারা
> মুখ ফিরায়ে রয় প্রাণের বন্ধু যারা।
> ডেকে সুধায় না যাও বন্ধু কোথা,
> মরমের ব্যথা কাহারে জানাই।"

এদিকে অনেকদিন গোলাল বিবির কোনো খবর না পেয়ে বেরাহিম বনে বনে খুঁজে খুঁজে হয়রান। অবশেষে পত্নী ও পুত্রের দেখা পেলেন। অনুতপ্তা কণ্ঠে গুলাল বেরাহিমের উদ্দেশ্যে বললেন—

> "এই অচ্ছেদ্য ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করে আজ
> সাতটি বছর তুমি কেমন করে ফাঁকি দিয়ে ছিলে?
> অতি ভালোবাসার পরিণাম কি এই রূপ ধারণ করে?"

মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ করে এখন ঘরে ফেরার পালা, এমন সময় দেখা

হয়ে গেল মাতৃপরিত্যক্ত কন্যা বনবিবির সঙ্গে, শাহজঙ্গলীকে দেখে বনবিবি বলে—

> "মা, বাপের সঙ্গে আর আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন
> নেই। বাদাবনের আঠারো ভাঁটিতে হবে আমাদের
> জহুরা।"

মায়ের করুণ প্রার্থনাতেও ভাই-বোন সাড়া না দিয়ে পিতামাতাকে বোঝালেন যে, পুত্র-কন্যা ছেড়ে যেন তারা ঘরে ফিরে যায়। এরপর 'মুরিদ' হবার জন্য ভাই-বোন যাত্রা করলেন মদিনার উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে তারা ফতেমার গোরে 'জিয়ারত' করবেন এই আশা নিয়ে প্রথম অঙ্কের যবনিকাপাত।

বিষবস্তু : দ্বিতীয় অঙ্ক

বনবিবি বাদা রাজ্যের সর্বময়ী অধিশ্বরী হয়ে রইলেন, তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারই বনবিবি পালার মূল লক্ষ্য। তাই বোনবিবি 'জহুরানামা'য় বনবিবির মাহাত্ম্য নামে একটি উপকাহিনি আছে। যেটি 'ধোনা মৌলে' ও 'দুখে সাহার' কাহিনি বলে সমধিক পরিচিত। আমাদের আলোচ্য লোকযাত্রার মূল বিষয় এখান থেকে শুরু বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতেই ধোনা মৌলের স্বপ্নাদেশের পরিচয়—

> "কে যেন কহিলো আমারে, যাও ধনা
> সপ্তুতরী করি সুসজ্জিত মহালেতে করোহ গমন।"

আসলে সুন্দরবনে চৈত্রমাস আক্ষরিক অর্থেই মধুমাস, জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে বড় বড় গাছের ডালে মধু আর মধু। কিন্তু ভয়াল-ভয়ংকর নিসর্গ নিকেতন সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ দুর্বার। মানুষ তাই মৃত্যুভয়ের উপেক্ষা করে বারবার পাড়ী দেয় দক্ষিণ রায় ও বনবিবির রাজ্যে।

দৈববাণীর কথা স্মরণ করে বাদাবনে মহল করতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে ধনা— ভাই মনোহরের কাছে। ভাই কিছুতেই তাকে বাঘের বনে যেতে দিতে চায় না, কিন্তু ধোনার অভিব্যক্তি—

> "বন থেকে মোম-মধু সংগ্রহ করে শহরে এনে বিক্রয়
> করবো, তাতে অনেক টাকা লাভবান হওয়া যাবে।"

ভাই মনোহর তবুও ধনাকে বাঁধা দিতে চায় মহলে না যাওয়ার জন্য, গানগেয়ে বলে—

> "মহলের কথা ধনা
> বলো নাকো আর
> মহলেতে গেলে ধনা—

না ফিরিবে দেশেতে আর
শুনেছি সেই গহন বনে বাঘ-ভাল্লুক আছে অনেক
বনের কথা মনে হলে দুরু-দুরু কাঁপে অন্তর।"

কিন্তু সমস্ত বাঁধা অগ্রাহ্য করে ধনা মনোহরকে সাতখানা বাণিজ্যতরী এবং চৌদ্দ গোণ্ডা লোক সংগ্রহ করে আনতে বলে।

এরপর গীতকণ্ঠে মাঝি-মাল্লার প্রবেশ এবং মহলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ। তারপর টাকার বিনিময়ে মাঝিদের রাজি করানো এবং দাঁড়ি-মাঝি, চাল-ডাল সব নৌকায় তোলার পর দেখা গেল একটি মাত্র লোক কম পড়েছে। গ্রামে দুখে নামে এক গরীব বালক ছিল। এ জগৎ সংসারে তার মা ছাড়া আর কেউ নেই। গেরস্থের গরু চরানোই তার একমাত্র কাজ। দুখে ধোনার খালিতো ভাইয়ের ছেলে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে ধোনাই দুখে ও তাঁর মায়ের কাছে গেলো। শেষপর্যন্ত অর্থের প্রলোভন ও সর্বোপরি বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সে দুখেকে রাজি করায় কিন্তু দুখের মা দুখেকে কিছুতেই বনে যেতে দিতে চায় না। সর্বোপরি দুখের উৎসাহ এবং ধনার পীড়াপিড়িতে অগত্যা মাকে রাজী হতে হয়। বিবিজান ধনাকে গীতকণ্ঠে বলে—

" দেখো ধনা আমার দুখে যেন কাঁদে না,
দুখে আমার অবোধ ছেলে বনের কষ্ট জানে না।
যখন কাঁদবে মা-বলে, নিও ধনা কোলে তুলে,
দুখে আমার অবুঝ ছেলে মাবৈ কিছু জানে না।
অতি দুখিনির দুখে, রেখো ধনা পরম সুখে।
ক্ষুদা পেলে ক্ষেতে দিও, যেন কষ্ট পায় না।"

যাওয়ার সময় দুখেকে ডেকে মা বলে দেয়—

"বনের মা বনবিবি বনের মাঝারে
বিপদে পড়িলে ডেকো মা বলিয়ে তারে।
অঠারো ভাটার মধ্যে উনি সবাকার মা,
যে ডাকে মা-মা বলে, তার দুঃখ থাকে না।"

মাতা-পুত্রের বাৎসল্যরসের ধারায় এই অংশটি নাটকীয় উৎকর্ষ তথা শিল্পতাৎপর্য লাভ করেছে। তাই দুখেকে বিদায় দিয়ে মায়ের যন্ত্রণা আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে এভাবে—

"জায় জায় গো, আমার দুখে বনে যায়
ওগো তোমরা ধরো ধরো, ওকে মানা করো,
দুখে বই আর কেউ নাই।
পেয়ে ধনার মন্ত্রণা শোনেনা আমার মানা।

ঘটালো কি যন্ত্রণা— আমার কপালে,
আমি অভাগিনী এজন্ম দুখিনী—
দুখেবই আর কেহ নাই, এই অভাগিনীর,
একবার ফিরে আয়" (বিবিজানের গীত)

২য় অঙ্কের পঞ্চ মদৃশ্যে দুখে ও মাঝিগণসহ ধনা মহলের উদ্দেশ্য রওনা দেয়। নৌকা ছাড়ার পূর্বে মাঝিগণ গেয়ে ওঠে—

"নৌকা খোলো, বাদাম তোলো,
ভাটা বয়ে গেলো,
চৈত্রমাস গত হইলো— চালচালান
সব নৌকায় তোলো
ও মুখে আল্লা-আল্লা বলো (২)
নৌকা খোলো।"

এরপর ধনার আদেশে মাঝি-মাল্লারা গানের মধ্যে দিয়ে যাত্রা পথের অপূর্ব বর্ণনা করতে থাকেন। মাঝিদের গানের মধ্য দিয়ে উঠে আসে 'দুখে যাত্রা'র সমাজ-বাস্তবতার নির্দশন। হাসনাবাদ, বরুণহাটি প্রভৃতি অঞ্চল; কানাই কাটির গঙ্গা, রায়মঙ্গল, মাতলা প্রভৃতি নদী অতিক্রম করে অবশেষে বাদাবনের গড়খালিতে গিয়ে ধনার নৌকো নোঙর করলো; এখানেই দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তি।

তৃতীয় অংক : বিষয়বস্তু :

অংকের শুরুতে দক্ষিণ রায় ও সনাতনের কথোপকথনে উঠে আসে সুন্দরবনের অপূর্ব নিসর্গ প্রকৃতির রূপময়ী বসন্তকালীন পরিচয়। গাছের প্রত্যেকটা শাখা মধুভারে অবনত, চর্তুদিকে শান্তির সুখলহরী মুখরিত হচ্ছে। এই শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য সনাতনকে সর্বদা পাহারায় নিযুক্ত থাকতে বললেন দক্ষিণ রায়, তিনি আরও বলেন—

"এই হাটে সওদা করবার জন্য কত সাধু-বনিক ডিঙ্গা সাজায়ে আসবে। আমাদের পূজা করবে ... তাই বলছি আমাদের পূজা না দিয়ে, কেউ যেন এক ফোটা মধু না নিয়ে যেতে পারে। যদি কেউ আমাদের অজ্ঞাতে মোম-মধু নিয়ে যায় তাহলে আমাদের কোন প্রভাব থাকবে না।"

শান্তি-রাজ্যে যাতে অশান্তির জল প্রবেশ না করতে পারে, তার জন্য সনাতনকে ডাকিনী-জোগিনীর শরনাপন্ন হতে বললেন। এভাবে ডাকিনী-যোগিনীর আগমন এবং তাদের গীতের মধ্যে দিয়ে শতর্কবাণী ঘোষিত হল—

"জয় জয় কালি মায়কি জয়

ধেইয় ধেইয়া নাচে বুড়ি চমকে দেখায় ভয়—
যাও যাও সনাতন, দেরি করো না,
নরপূজা না দিলে মধু পাবে না।" (ডাকিনী-যোগিনী প্রস্থান)

এদিকে ডিঙ্গা সাতটি কিনারায় বেঁধে মধুর সন্ধানে সবাই বনে প্রবেশ করলো। একা দুখে রইলো নৌকোয়। দক্ষিণ রায়কে পূজা ও নরবলি না দিয়ে ধনামৌলে মোম-মধু পেতে চায়। তা কি করে সম্ভব! এদিকে, নরমাংসের জন্য সনাতনের হাহাকার, আবার দক্ষিণ রায়ের চাই পূজা, এভাবে তিনদিন কেঁটে গেল, অথচ একফোঁটা মধু ধোনা এখনো পেল না—

"হায় খোদা এত টাকা কড়ি এনে, এত লোকজন
নিয়ে এক ফোটা মধু পেলাম না, কেন আমি ভাইয়ের
কথা শুনিনি, খোদা আমাকে কিছু মোম-মধু দাও।"

এমন সময় দক্ষিণ রায় ধনাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন—

"দণ্ডবক্ষ মুণি ছিল ভাটার প্রধান, দক্ষিণ রায় নাম
মোর তারই সন্তান, বনে যত মোম-মধু সব আমার সৃষ্টি,
যে জন করে পূজা তারে দেহ দৃষ্টি।"

বহুদিন আমি নরবলি পূজা পায়নি। "তুই যদি পারিস নরপূজা দিতে, সপ্ততরী মোম-মধু আমি তোকে পারি দিতে।" "অষ্টম বর্ষীয় শিশু নাম যার দুখে, তাকে দিয়ে মোম-মধু নিয়ে যাও সুখে।" এমন প্রস্তাবে সহজে ধনাই রাজি হতে পারে না, দেশে ফিরে যেতে চায় সে। কিন্তু দক্ষিণ রায়ও ছাড়বার পাত্র নয়— তাঁর যে নরবলি একান্ত প্রয়োজন, তাই সে ধনার সমস্ত লোকজনদের কুমীর দিয়ে খাওয়ার ভয় দেখায়, তবু ধনা দুখেকে দিতে রাজি হয় না। অথচ দক্ষিণ রায়ের দৃষ্টি দুখের উপরে, তার সংলাপে ধরা পড়ে বজ্রকঠিন প্রতিজ্ঞা—

"পুর্বের্বর ভানু যদি পশ্চিমে প্রকাশে,
অমাবশ্যায় নিশিতি যদি চন্দ্রিমা আকাশে,
ভেকদান ফনিশিরে যদি নিদ্রা যায়,
কোকিলের কণ্ঠে যদি বায়সেতে পায়,
পিপিলার পায় যদি ক্ষিতি টলমল
তথাপি প্রতিজ্ঞা আমার অচল অটল।"

গীতকণ্ঠে ভাক্তমালা জানিয়ে যায়—

"খবর্দার খবর্দার খবর্দার—
ঐ চেয়ে দেখ হাঁ করে আছে সামনে নরকদ্বার,
আমি রতনের খনিগিরি হিমালয়,
সাহারার মরু আমি জ্বালাময়,
আমার ইঙ্গিতে রয়েছে মঙ্গল সবাকার।"

শেষ পর্যন্ত কেঁদোখালির চরে নরমাংসলোভী দক্ষিণ রায়কে ধনা দুখেকে দিতে রাজি হয়, এই শর্তে—

"রায় ঠাকুর আমি দুখেকে দিতে স্বীকৃত, কিন্তু জগতের
লোক যেন কেউ জানতে না পারে।"

দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে ধনার এই কথোপকথন জেগে সবই শুনতে পেল দুখে—

"শুনি মোরে ধনা চাচা রায়ে যাবে দিয়ে,
চাচা যাবে দেশে চলে মোম-মধু নিয়ে।
দেশেতে গিয়ে চাচা ধনবান হবে,
মা দুখিনী-অনাথিনী ভিক্ষা মেঙে খাবে।"

মায়ের মুখ মনে পড়ে গেল ছোট্ট দুখের, এমতাবস্থায় প্রাণভয়ে ভীত বালক বনবিবিকে স্মরণ করে—

"কোথায় আছো বনবিবি দেখা দাও মা,
বিপদের কালে মাগো দেখা পাব না?
শুনিয়াছি মায়ের মুখে তুমি মাতা বিপদতারিণী।"

দুখের কান্নায় আসন টলে গেল বন-মাতার। এমন সময় দুখের কণ্ঠে গীত হলো মা-মা-মা ধ্বনি—

"মা-মা-মা তোকে ডাকবো কত
পাষাণ হৃদয় কি তোর গলে না—
না হয় যদি মা-মা বুলি—
ডাকবো তোকে কি বোল বলে।
এ যে মায়ের দেওয়া মা-মা বুলি
আমি আর তো কিছু জানি না।" (গীত/দুখে)

এবার বনোবিবি দুখের সামনে ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে বলে—

"কেনো বাছা ডাকিয়াছো ওরে যাদুধন,
আসিবার কালে তোকে করিনু বারণ।
না শুনিলে মায়ের বাণী পেয়ে ধনার মন্ত্রণা,
ধনার হাতে পড়ে এখন ঘটিলো কি যন্ত্রণা।"
(বনবিবি)

দুখের কাছে উপস্থিত হয়ে, ছদ্মবেশ ত্যাগ করে দুখের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনে মা দুখেকে আশ্বস্ত করেন—

"এসো আমার কোলে
আজ হতে দুখিনির ধন তুমি আমার ছেলে।"

ধনা মৌলের এখন পূর্বশর্ত পূরণের পালা, তাই পূর্ব শর্তানুসারে ধনাই নৌকা নিয়ে এলো কেঁদোখালির চরে; দুখেকে নৌকায় রাখা হলো রান্না-বান্না করার জন্য। দক্ষিণ রায়ের কথা মতো ধোনা মৌলের স্বপ্নপূর্ণ হতে চলেছে। অপরদিকে দিদি বনোবিবির কাছে দুখের কাহিনি শুনে ভাই জঙ্গলী দুখেকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত—

"আমি দুখের রক্ষার জন্য ছায়ার মতো তার পিছু পিছু
ঘুরবো। দেখি সে কি করতে পারে।"

বনবিবিও দুখেকে আশ্বাস দিয়ে বললো—

"বাপ দুখে তুমি যখন বিপদে পড়বে, আমার নাম
স্মরণ করলে আমি তখনই তোমার বিপদ থেকে
উদ্ধার করবো।"

এদিকে ধনা, সাধুভাই, রহিম, আলগজ ও অন্যান্য মাঝি-মাল্লারা নৌকা ছেড়ে কেঁদোখালিতে যেতে প্রস্তুত। এ সময় দুখেকে কর দেওয়ার বৃত্তান্ত ধনাই অন্যান্য মাঝিগণের জানায়, দুখেও মাঝিদের কেঁদোখালিতে যেতে নিষেধ করতে থাকে। কিন্তু দুখের কথা কে শোনে?

"আমি চলিলাম কেন্দোখালী—
নিষ্ঠুর হলো চাচা আমার,
কাল হল রায়মনি।
শুনিলে মা আমার কথা
পাষাণে ভাঙিবে মাথা
আমি ছাড়া কেহ নাই আর
মা যে জনম দুখিনী।"

(দুখে/গীত)

এখানেই তৃতীয় অংক সমাপ্ত।

৪র্থ অংক : বিষয়বস্তু

প্রথম দৃশ্যে, বনবিবি ও জংগুলী বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে দক্ষিণ রায়কে ধরার জন্য। দ্বিতীয় দৃশ্যে ধনা ও তাঁর মাঝিরা দুখেকে নিয়ে কেঁদোখালিতে উপস্থিত। দুখেকে নৌকায় রেখে সবাই মালে ওঠে মধু সংগ্রহ করতে। দুখেকে ডিঙ্গায় রাখা হলো রান্না-বান্না করার জন্য। কাঁচাকাঠে, রান্না করতে গিয়ে দুখে নাজেহাল হয়ে বনবিবির স্মরণ করে—

"কোথায় আছো বিপদতারিণী মা বনবিবি,
দেখো তোমার দুখে কি বিপদে পড়েছে।"

বলতে বলতে দুখের সামনে মা বনবিবি এসে উপস্থিত হলে, দুখে গীত ধরে—

কাঁচা কাষ্ঠ নাহি জ্বলে
ছাঁদা হাঁড়ি মা এমনি গলে।

দুখের এই করুণ অবস্থা দেখে মা বনবিবি নিজেই ধনা মৌলের ভাত রান্না করে দিতে অগ্রসর হয়—

"সরে বসো তুমি, অন্ন রাঁধি আমি,
মহলেতে ধনা আসিবার লাগি—
আমার হাতের খানা, ধনা লয়ে খাবে,
চৌদ্দপুরুষ ধনার উদ্ধার হয়ে যাবে।"

এদিকে রায়ের অনুগ্রহে ধনার সপ্তডিঙ্গা কানায় কানায় মধুতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই ধনা সাধু বাইকে বলে নৌকা যে মারা যায়, তোমরা করছো কি? নেপথ্যে দক্ষিণ রায়ের বাণী—

"দেখ ধনা মধু ফেলে দিয়ে মোম বোঝাই করে নিয়ে যা,
মধুর চেয়ে মোমের দাম অনেক।"

রায়ের কথামতো ধনা সাধু ভাইদের সমস্ত মধু ফেলে দিয়ে মোম বোঝাই করতে বলে, এখানকার নাম তাই 'মধুখালী'।

নৌকায় ফিরে দুখের হাতের রান্না খেয়ে সবাই অবাক হয়ে যায়। মাঝিগণ খেতে খেতে কানাকানি করে বলে— এ 'দুখের হাতের খানা না'। দুখের হাতের অমৃত সমান রান্না খেতে খেতে রহিমের গলায় ভাত আটকে যায়; শেষ পর্যন্ত দুখের হাতের জল খেয়ে রহিম প্রাণ ফিরে পায়।

রহিমের পূর্বকথা মতো দুখেকে বনে তুলে দেওয়ার জন্য ধনামৌলের সঙ্গে মাঝিগণের কু-পরামর্শ চলে, টাকার বিনিময়ে মাঝিরা দুখেকে জঙ্গলে তুলে দিতে রাজি হয়। কিন্তু কিভাবে দুখেকে জঙ্গলে রেখে আসা হবে, তার সঠিক সমাধান রহিমের যুক্তিতে মেলে—

"আমি ঠিক করেছি নৌকায় কাঠ আনার ছল করে
ওকে বনে তুলে দেওয়া হবে।"

এই মতলব বুঝতে দুখের বাকী থাকে না। সে বনে কাঠ আনতে যেতে চায় না। এরপর দুখেকে বেঁধে রাজি করানোর চেষ্টা করে সবাই। কাকা ধোনাও কোনকথা শুনতে চায় না। অবশেষে দুখে বনে গেল কাঠ আনতে। দুখে বনে যেতে না যেতেই

ধোনাই নৌকা খুলে দিল। কাঠ নিয়ে ফিরে এসে দেখে কোন নৌকা নেই। দুখে কাকাসহ অন্যান্য মাঝিগণের দেখতে না পেয়ে চিৎকার করতে করতে গান ধরে—

"বলি ও-ও চাচাজী লা ভিড়াও না ভিড়াও কিনারে
বিয়ে দেবে বলে চাচা, এনেছিলে বনে
ভালো বিয়ে দিলে দাদা বাঘেরও সম্মুখে
দুখিনী মায়ের কাছে খবর কইও তারে।"

এরপর দুখে ভয়ে চীৎকার করতে থাকে, কে কোথায় আছ আমাকে বাঁচাও। এদিকে বাঘের গর্জন শুনে দুখে মা বনবিবির শরনাপন্ন হয়। এবং আমাকে রক্ষা করো বলতে বলতে ভূতলে পতন করে। এমন সময় বাঘ এসে দুখেকে খেতে গেলে, সহসা বনবিবি এসে বাঘের মুখে চড় মেরে দুখেকে কোলে তুলে নেয়। রাক্ষস তথা দুরাচার দক্ষিণ রায়কে কিছু উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্য জঙ্গলীকে নির্দেশ দিলেন। দক্ষিণ রায় ও জঙ্গলীর মধ্যে কথা কাটাকাটি ও একে অপরকে বংশ নিয়ে নিন্দা চলতে থাকে। তারপর উভয়ের যুদ্ধ ও সনাতনের প্রবেশ। তুমুল যুদ্ধের পর দক্ষিণরায় পরাস্ত হয়ে পলায়ন করতে থাকে, এমন সময় সম্মুখে বরখান গাজীর দেখা। বন্ধু দক্ষিণ রায়ের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে বরখান গাজী সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন। এরপর দক্ষিণ রায় বরখান গাজীকে ঘটনা-বৃত্তান্ত খুলে বলেন—

"ধনা নামে মৌলে এক এসেছিলো বনে। দুখে নামে
করদেয় দুখিনীর ছেলে। উল্লসিত হয়ে যাইনু গ্রাসিতে,
এক ছোকরা এক ছুকরী এলো কোথা হতে। ছুকরীর
রূপের কথা কহনে না যায়, কেন্দোখালী বন যেন
হলো আলোকময়। যেন সন্ধ্যারবি উদিত আকাশে,
ব্যাটার বিক্রমের কথা আমি কি কব হুজুরে। একচড়
মেরে মোরে দিলো সুবাইয়ে।"

অতঃপর দক্ষিণ রায়ের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বরখান গাজী বলেন—

"কেন বন্ধু আমিতো পূর্বেই বলেছি যে, তুমি ওদের
সঙ্গে পেরে উঠবে না। ওরা সাধনায় পীর হয়েছে,
ওদের সঙ্গে লড়তে তোমার শক্তিতে কুলাবে না।"

তাহলে বন্ধু আমার উপায়? এমন সময় জঙ্গলী সেখানে এসে পৌঁছালেন, এবং 'উপায় আমি করছি সদয় হইয়া' বলে 'মুহূর্তে পাঠাইবো তোরে সমন আলয়'। গাজী জঙ্গলীকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দক্ষিণ রায়কে না বন্দি করা পর্যন্ত জঙ্গলী গাজীর কোনো কথা শুনতে নারাজ। নানা প্রকারে গাজী জঙ্গলীকে শান্ত করার চেষ্টা করেন, অবশেষে সকলে মিলে—

'ভ্রুকুণ্ডিয়ায়' মায়ের কাছে (বনবিবির কাছে) যাওয়া
স্থির করেন।

এদিকে ধনা মৌলেও মাঝি-মাল্লাদের নিয়ে বাড়ি ফেরে। দুখের মার কাছে সে কি বলবে, তাই নিয়ে চিন্তা করতে থাকে—

"দুখের মার কাছে আমি কেমন করে একথা উচ্চারণ
করবো, যে দুখেরে বনে কর দিয়েছি। নিজ স্বার্থসিদ্ধির
জন্য কি কর্মই না করেছি। আমার এ পাপের পরিণাম
কি হবে খোদা? জগতের লোকে সবাই বলবে ধনা
বিশ্বাস ঘাতক— ধনা বিশ্বাস ঘাতক!"

পঞ্চম অঙ্ক : বিষয়বস্তু

বনবিবির সামনে ভ্রুকুণ্ডায় জঙ্গলী, গাজী ও দক্ষিণ রায় উপস্থিত হয়। বনবিবি গাজীর পরিচয় জানতে চাইলেন, গাজী আত্মপরিচয় দেন এই বলে—

"আমি বরখান গাজী, বাপের নাম হচ্ছে সাহা
সেকেন্দার, বহুদিন হলো তিনি পরলোক গেছেন।"
"মা নারায়ণী যে আপনার ধর্মসই, ইনি যে তাহারই
সন্তান।"

গাজীর পরিচয় দানে বনবিবি বুঝতে পারেন দক্ষিণ রায়, দুখে ও বড়খাঁ গাজী সবাই তাঁর সন্তান, এভাবেই বনবিবির সামনে দুখে, দক্ষিণ রায় ও বড়খাঁ গাজী তিন ভায়ের মিলন হয়। এরপর বনবিবি দক্ষিণ রায়কে ক্ষমা করে দেন এবং তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করান—

"বনে এসে যে আমার নাম স্মরণ করবে,
তাকে তুমি কখনো আঘাত করবে না।"

এরপর মায়ের কথা শুনে দক্ষিণ রায় বনকে রক্ষা করার জন্য যে কথাগুলি বলেন, তা এরকম—

"কিন্তু মা— বনে এসে সবাই মা-মা বলে মেদিনী
কাঁপায়ে ডাকে। কিন্তু ভক্তি করে কয়জনে ডাকে,
ভক্তিবিহীন মুড়ো মোর কাছে ক্ষমা নাহি পাবে। আর
একটা কথা মা, আমাদের এই সখের রাজ্যে যদি
অনাচার-অত্যাচার আরম্ভ হয়, আর আমি যদি শাসন
না করি, তাহলে জগতে মেয়ে-মরদে সকলেই মহল
করিতে আসবে। আর আমাদের এই বনরাজ্য দুদিনেই

ধ্বংস হয়ে যাবে।"

দুখের প্রতি দক্ষিণ রায়ের ব্যবহার সত্যিই অবিচার তা দক্ষিণ রায় স্বীকারও করে। তাই দুখের মত ভক্তি করে যারা ডাকবে, দক্ষিণ রায় কোনদিন তাদের আঘাত করবে না তাও প্রতিজ্ঞা করে। দুখের মত অনাথকে সাহায্য করার জন্য বনবিবি সকলকে বলে। ছোটভাই দুখেকে গাজী 'সাতমেটে' টাকা দেবেন এই অঙ্গীকার করেন, আর দক্ষিণ রায় দুখেকে দিতে চায় মোম, মধু, কাঠ-পাতা, যা বাড়ীতে বসে নাম করলেই সব পাওয়া যাবে। অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে গাজী ও দক্ষিণ রায় স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করলেন।

দুখের সকল আশা পূর্ণ্য হলো বটে, তবু দুখে দেশে যেতে চায় না, সে বনবিবির কাছে থাকতে চায়, এদিকে বনবিবি দুখের মায়ের কান্না শুনতে পান। গ্রামে সবাই জানে দুখেকে বাঘে খেয়েছে।

এই কলঙ্ক থেকে বনবিবি ও জঙ্গলী নিজেদের রক্ষার্থে দুখেকে গ্রামে ফিরতে বলে, অবশেষে দুখে বনবিবির কথামতো 'কুমীরে'র পিঠে চেপে বাড়ির পথে যাত্রা করে।

ধনার মুখে দুখের বাঘে খাওয়ার গল্প শুনে দুখের মা বিবিজানের মূর্চ্ছা, জ্ঞান ফিরলে মায়ের করুন আর্তনাদ ধনাকে বিস্মিত করে।

'হায় ধনা কি শুনালি কলিজা হইল খালি, শোকের
তীর হানলি মোর বুকে? দুখিনীর ধন নিয়ে কোথায়
হারায়ে এলি, কে ডাকবে মা বলিয়া মোরে?'

পাগলিনীর মত উন্মাদ হয়ে মা বিবিজান ঘুরে বেড়ায়, পুত্রহারা শোকে মাতৃহৃদয়ের যন্ত্রণা এখানে অন্য মাত্রা লাভ করে।

এরপর দুখে বাড়ি ফিরে মায়ের আজ্ঞায় বনবিবির পূজা দেবে বলে ভিক্ষা করতে শুরু করে—

"শুনো নগরবাসী, তোমরা ভিক্ষা দাও,
তোমরা সবে না দিলে ভিক্ষা
আমি ভিক্ষা কোথায় পাবো গো;
ভিক্ষা দাও নগরবাসী ভিক্ষা দাও আমারে,
আমি মায়ের 'খয়রাত' করি গো।"

মায়ের কথা মতো দুখে বনবিবির 'হাজত খয়রাত' দিল। গাজীর দেওয়া ধন-সম্পদ ও দক্ষিণ রায়ের বাদান্যতায় এবং বিশ্বকর্মার সহায়তায় দুখের ঘর-বাড়ি হল। এবং তার মায়ের আদেশে ধোনা চাচার কন্যার সঙ্গে দুখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এখানেই কাহিনির সমাপ্তি।

দুখে যাত্রা

কা হি নি উ ৎ স :

মোহাম্মাদ খাতের বিরচিত : বোনবিবি জহুরানামা নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা
আব্দুল রহীম সাহেব প্রণীত : বোনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি

না ট্য রূ প : সুরেন্দ্র মণ্ডল

পালা অভিনয় : (কোথায় কোথায় অভিনয় হয়েছে।)
কালীতলা, সমসেরনগর, ন্যাজাট, মোল্লাখালী, যোগেশগঞ্জ, জেলেখালী, হাসনাবাদ, ভোলাখালী, সন্দেশখালী, পারঘুমটী, কুমীরমারী, হাড়োয়া, ঝরীর জাঙ্গাল, মৌখালী, তুষখালী, ধুচনীখালী, আমতলী, সাতজেলিয়া, সুন্দরবন জঙ্গলে ইত্যাদি।

পরিবেশনা : বন্ধুমহল নাট্যসংস্থা (কালীতলা, হিঙ্গলগঞ্জ, উত্তর ২৪ পরগনা)

পালাকার : সুরেন্দ্র মণ্ডল

নির্দেশনা : সুরেন্দ্র মণ্ডল ও মানবেন্দ্র বিশ্বাস

সুরকার : লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল ও বিনোদ মণ্ডল

ম্যানেজার : স্বপন মণ্ডল ও তপন গায়েন

কোষাধ্যক্ষ : সুভেন্দু মণ্ডল ও ধীমান বৈদ্য

চ রি ত্র লি পি

চরিত্র	চরিত্র পরিচিতি	অভিনেত্রী/অভিনেতা
বনবিবি	বেরাহিমের কন্যা	ললিতা, অপর্ণা মণ্ডল, শর্মিলা গায়েন
বিবিজান	অসহায় বিধবা, দুখের মা	গৌরী, কণিকা মণ্ডল
ফুলবিবি	বেরাহিমের ১মা স্ত্রী	রেবা গায়েন, সুচিত্রা বৈদ্য
গোলাল	বেরাহিমের ২য়া স্ত্রী	গৌরী মণ্ডল, অর্চনা বৈদ্য
নারায়ণী	জঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দণ্ডবক্ষ মুনির স্ত্রী	সুচিত্রা মণ্ডল, বিবি মণ্ডল, সুচিত্রা বৈদ্য

চম্পা	ধোনার কন্যা	সুষমা মণ্ডল
ডাকিনী	দক্ষিণরায়ের আজ্ঞাবহ	রবি মণ্ডল
যোগিনী	দক্ষিণরায়ের আজ্ঞাবহ	পরেশ মণ্ডল
দুখে	ধোনার প্রতিবেশী অসহায় বালক, বিবিজানের পুত্র	হরিপদ গায়েন, সুধীর মণ্ডল
জঙ্গলি	বেরাহিমের পুত্র	বিষ্ণুপদ মণ্ডল, গনেশ মৃধা
দক্ষিণ রায়	জঙ্গল অধিপতি, দণ্ডবক্ষ মুনির পুত্র	বাটুল গাজী, ভীমসেন মণ্ডল
বড়খান গাজি	জঙ্গল অধিপতি	দেবদাস ঘোষ
ধোনা	মউলে	সুরেন্দ্র মণ্ডল
মনোহর	ধোনার ভাই	সুপদ মণ্ডল, স্বপন মণ্ডল
১ম মাঝি	মাঝি	স্বপন মণ্ডল
২য় মাঝি	মাঝি	তপন গায়েন
৩য় মাঝি	মাঝি	কৃষ্ণপদ রপ্তান, সুকুমার গায়েন
সাধুভাই	প্রধান মাঝি	যোগেশ মণ্ডল, ভূবেন মণ্ডল
সনাতন	দক্ষিণ রায়ের সেনাপতি	মুরারী মণ্ডল
প্রতিবেশী	একজন মহাজন	জলধর বৈদ্য
রাম সিং	দুখের দ্বাররক্ষী	অশোক মণ্ডল
বিশ্বকর্মা	যন্ত্রপাতির দেবতা, মিস্ত্রি	পরিতোষ বৈদ্য
শ্রমিক	মজুর	পরেশ মণ্ডল
১ম চোর	চোর	রবি মণ্ডল
২য় চোর	চোর	পরেশ মণ্ডল
৩য় চোর	চোর	হরিপদ গায়েন
৪র্থ চোর	চোর	অলোক বৈদ্য
সেঁকো	কুমির, বনবিবির আজ্ঞাবহ	তপন গায়েন
বিবেক		পরিতোষ বৈদ্য, সুকুমার গায়েন
ভাঙড় সাহ		সুরেন্দ্র মণ্ডল, রবীন্দ্র মণ্ডল
ফতেমা		সুচিত্রা বৈদ্য
মঞ্চ পরিকল্পনা		মানবেন্দ্র বিশ্বাস

পরিচালনা : সুন্দরবন স্মৃতি সংঘ

বন্দনা

নমস্তে মা বীণাপাণি নম নম নারায়ণী (২)
নমস্তে মা নমস্তে মা বীণাপাণি নম নম নারায়ণী
ত্রিগুণ মা তিগা তিগা বেদ-বিদ্যা বিদ্যায়ণী (২)
নমস্তে মা বীণাপাণি নম নম নারায়ণী।
নমস্তে মা নমস্তে মা বীণাপাণি নম নম নারায়ণী।
রজত গিরি সম অঙ্গে সুসোভন অঙ্গিয় চিরশুভ
সংকট মা নিস্তারিণী
নমস্তে মা নিস্তারিণী
নমস্তে মা নমস্তে মা
নমস্তে মা—।

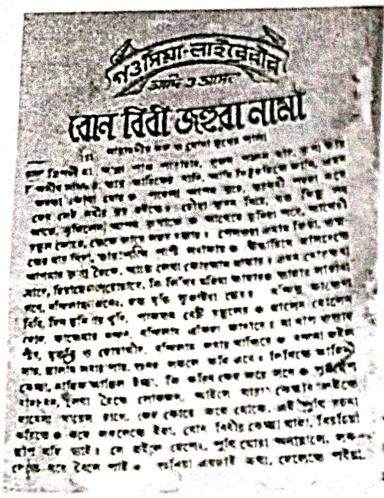
গওসিয়া-লাইব্রেরী

বোন বিবী জহুরা নামা

গওসিয়া-লাইব্রেরী থেকে প্রাপ্ত বোনবিবি জহুরা নামা (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা) পুথির ফটো চিত্র।

বোনবিবি জহুরা নামা

ওস্মানিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রাপ্ত বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথির ফটো চিত্র।

প্র থ ম অং ক

প্রথম দৃশ্য

(চিন্তানিত বেরাহিমের প্রবেশ)

বেরাহিম : হায় খোদা, তুমি দুনিয়ার জীবকে কি খেলাচ্ছ জানি না। কাউকে হাসাচ্ছো আবার কাউকে কাঁদাচ্ছো। যাদের সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ভিক্ষান্নে উদর পূরণ হয়না, তারা সুখি, আর যারা রাজভোগ খাচ্ছে, দুগ্ধফেনানিত সুকোমল শয্যায় শয়ন করছে, তার মতো দুঃখী হয়তো সংসারে দুটি নেই। এত ধন-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছি তবুও একটু শান্তি পাই না। পুত্রহীনের গৃহ শূন্য। ফলহীন বৃক্ষ, জলহীন নদী, শস্যহীনা বসুন্ধরা, কৈ কেউতো শোভা পায় না। খোদা যদি সংসার কর্মে চালিত করছো, তবে কেন রাখ অসম্পূর্ণ মানুষের কল্পনা, যা এঁকে রাখে— তুমি কর তার বিপরীত। খোদা তোমার ইচ্ছায় পূর্ণ হোক, তোমার ইচ্ছায় পূর্ণ হোক।

(ফুল বিবির প্রবেশ)

ফুল : আর ঐ সঙ্গে তোমার ইচ্ছাও পূর্ণ হোক স্বামী। পুত্র মুখ পাইবে দেখিতে। কিন্তু আমার একটা কথা আছে। বলো পালন করবে?

বেরাহিম : কেন করবো না প্রিয়ে। বল কি তোমার কথা। সত্যই তুমি কি আমার বাসনা পূর্ণ করবে?

ফুল : কেন করবো না? রছুল রবের গোরে যখন দুই জনে আরজ করলাম, তখন তিনি বেহেস্তে গিয়ে হজরত জীবরাইলের কাছ থেকে কোরান দেখে এসে বল্লেন, দ্বিতীয় দ্বার গ্রহণ করলে দুটি সন্তান সন্ততি লাভ হবে। তাই আমি তোমাকে অনুমতি দিতে এসেছি।

বেরাহিম : আমিও অনেক আগে পাত্রী ঠিক করে রেখেছি। তোমার অনুমতি না পেলে সাদী করতে পারছি না। এই মক্কা শহরে জলিল ফকিরের শান্ত-শিষ্টা খোদা-পরায়না একটি কন্যা রত্না আছে। ও পরম রুপবতী। এখন তোমার আদেশ হলে সাদী করি। কন্যার পিতা-মাতা সকলেরই একান্ত ইচ্ছা, এখন বল তুমি কি চাও?

ফুল : তার আগে বলো তিন সত্য অঙ্গীকার করবে?

বেরাহিম : আমি প্রতিজ্ঞা করছি ফুল, চন্দ্র-সূর্য-বসুন্ধরা অস্তাচলে গেলেও আমার প্রতিজ্ঞা ল'ঘন হবে না। এখন বল তুমি কি চাও?

ফুল : এখন চাই না। সময় হলে চাইবো। এখন তুমি সাদী করতে পারো। (প্রস্থান)

বেরাহিম : শুভকর্ম সুসময়ে করা ভালো। জলিল ফকিরের কন্যা গুলাল বিবি সেই হবে ভাগ্যলক্ষ্মী মোর, দেখিবো পুত্রের মুখ, জুড়াবো হৃদয়, জীবনের যত জ্বালা হবে অবসান, হবে অবসান। (প্রস্থান)

(বনবিবির প্রবেশ)

বনবিবি : রহমানের হুকুমে, মর্ত্যলোকে হবে জনম মোদের, সংসার খেলায় মানব আকারে কত খেলাই খেলতে হবে কে জানে? কর্মময় জগৎ স্বার্থের কষাঘাতে মন চায় না যেতে।

(জঙ্গুলীর প্রবেশ)

জংগুলি : না গেলে তো নয় ভগ্নি। কর্মময় লীলাভূমি খোদার কর্মে হবো নিয়জিত। তাহে কেন ডরাইবো বল? আঠারো ভাটির মধ্যে হইবে জাহির, বৃক্ষের পাতায় পাতায় থাকিবে নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা। হ্যাঁ কাহার ঘরে লভিবো জনম ভগ্নি?

বনবিবি : মর্ত্যে— মক্কার শহরে বেরাহিম, জলিল ফকিরের কন্যা গুলাল বিবিকে সাদী করেছে। সেই গুলাল বিবির জঠরে মোদের জন্ম গ্রহণ করিতে হবে ভাই।

জংগুলি : তবে মিথ্যা কালক্ষেপে প্রয়োজন কি? চলো আমরা কর্তব্য কর্মে নিয়োজিত হই। তিনি যখন আমাদের সহায় তবে কিবা চিন্তা, কিবা ভয়। যাবো মর্ত্যলোকে ব্রাহিমের ঔরসে গুলালের গর্ভে লভিবো জনম। ধন্য হইবে মাতা-পিতা, উজ্জ্বল হইবে বংশের নাম। ব্যক্ত হবে চরাচরে মহিমা মোদের— বিশ্বের নরনারীর কাছে রহিবো পূজন। (প্রস্থান)

বনবিবি : বেরাহিমও সাদী করে বাড়ী এলো কিন্তু ফুলের হাতে তাকে বহু লাঞ্ছনা পেতে হবে। এরপর আমাদের যে কত লাঞ্ছনা খেতে হবে তা বিধিই জানেন।

(প্রস্থান)

বেরাহিম : অশান্তির সংসারে মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, শান্তি সে কোনোদিন ফিরিয়ে আনতে পারে না। ভুল করেছি, দ্বিতীয় দ্বার গ্রহণ করে। মনে করেছিলাম একটু শান্তি পাবো। কিন্তু এ যে দেখছি অশান্তির করাল গ্রাস আমার দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কোন দূরে বহু দূরে বহির দেশ হতে ঝটিকা ভীষণ মূর্তি ধারণ করেছে। আর রক্ষা নাই, অন্ধকার সব অন্ধকার। না-না-না ঐ যে আলোর ক্ষীণরেখা আমার দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। কিন্তু ও আলোতে আমি দেখতে পাবনা। দূরের আলো দূরেই থাকবে। কে, কে তুমি, কি চাও? কি চাও বলো, তুমি বলো?

(ফুল বিবির প্রবেশ)

ফুল : আমি যা চাই তুমি তাই দেবে?

বেরাহিম : কে ফুল? তুমি আসছিলে? বলো বলো ফুল তুমি কি চাও? তোমাদের দুজনের তো কোনো কিছুর অভাব রাখিনি। যখন যা চাচ্ছো তখন তাই যোগাচ্ছি। বলো ফুল এখন তুমি কি চাও?

ফুল : এখন আমি চাই গুলালের বনবাস দিতে।

বেরাহিম : উঃ ফুল!

ফুল : মনে আছে তোমার? যেদিন তুমি বিয়ে করতে যাও, সেদিন তুমি আমার কাছে তিন সত্যে আবদ্ধ আছো। আমি যা চাই তাই দেবে বলে স্বীকৃত ছিলে? আর আজ বুঝি গুলালের রূপ-যৌবনে মুগ্ধ হয়ে পূর্বস্মৃতি সব ভুলে গেছো? এখন বুঝি গাছ থেকে পড়ছো?

বেরাহিম : উঃ ফুল গাছ থেকে নয়। আমি আকাশ থেকে পড়ছি। একি, এ যে পৃথিবী ঘুরছে চন্দ্র-সূর্য অস্তাচলে চলে যাচ্ছে। জলোচ্ছ্বাসে ধরাভুবন অন্ধকারে গ্রাসিলো মেদিনী। গেলো গেলো সব রসাতলে। কে কোথায় আছো, আমাকে রক্ষা কর, কালভুজঙ্গিণী আমাকে দংশন করেছে। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। বিষ, বিষ তীব্র বীষ। উঃ কি ভীষণ ভুল আমি করেছি। ফুল তুমি অন্য কিছু প্রার্থনা করো। অথবা আমার হৃদপিণ্ডটা উপড়ে নাও। আমি দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু গুলালকে বনোবাসে দিতে পারবো না। এই গর্ভবতী অবস্থায় তাকে যদি বনে দিই, খোদার কাছে কি বলে কৈফিয়ৎ দেবো। আর যদি তোমার কথা পালন করতে হয়, কিছুদিন পরে করবো।

ফুল : ভাবিতে উচিৎ ছিলো প্রতিজ্ঞাকালে। তোমার ও সমস্ত অভিনয় আমি শুনিতে আসেনি। আর কিছুদিন পরে যদি বনে দেবে তাহলে আমি কি তোমার খাক পাকাচ্ছি। এইটুকু বোঝবার শক্তি তোমার হলো না। থাক তোমার আর সত্য রক্ষা করতে হবে না। (প্রস্থান)

বেরাহিম : নারীর চরিত্র পুরুষষ্য ভাগ্যং দেবা নঃজানমি কুতঃ মানবঃ। এই নারীর জন্যে সত্য শম্ভু নিশুম্ভু সংহার। ত্রেতায় ত্রিদেব বিজয়ী রাবণ সীতার জন্যে স্ববংশে নির্মূল। দ্বাপরে দন্ডী পর্বতে অষ্টব্রহ্মার সম্মেলন। নারী বিশ্বাস ঘাতিকী, পাপের ভয় করে না। স্বামীর বক্ষে ছুরিকাঘাত করে পুত্রের রক্ত চুষে খায়। সতীন চোখের বালি, আর পর-পুরুষ হৃদয়ের শ্বর। না না তাও না। দুদিনে তার ভালোবাসা সমূলে নির্মূল করে নিয়ে কুকুরের ন্যায় পদাঘাতে দূর করে দেয়। এদের মুখে মধু অন্তরে বিষে পরিপূর্ণ। নারীর চেয়ে অবিশ্বাশিনী জীব ত্রিভুবনে দুটি নেই। ভালোবাসা যে কি জিনিষ, নারী কোনোদিন জানে না। তার আস্বাদও পায়না, জানতেও চায় না। নিজের কর্মদোষে কি ভুল না করেছি।

(গীতকণ্ঠে ভক্তমালার প্রবেশ)

আপনার ভুলে সর্বনাশ করিলে
এখন আর ভাবিলে কি হবে বল।
সত্যরক্ষা করো পর পারের তরে।
সকল আশায় তোমার ঘটিবে জঞ্জাল।
সুসন্তান পাবে পরো কালের তরে।
ছিলো যা ভাগ্যে হবে না সফল।।

বেরাহিম : ঠিক বলেছে ভাই, এই সত্যরক্ষার জন্য ভীষ্ম ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করেছিলেন। ভীমগোলক বিহারী নারায়ণের সঙ্গে শত্রুতা অবলম্বন করেছিলেন। এই সত্যরক্ষার জন্য রাজা দশরথ পূর্ণ ব্রহ্ম রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া অন্তিম শয্যায় শয়ন করেছিলেন।

ও কি?

(দ্রুতো গুলাল বিবির প্রবেশ)

(উপরের মঞ্চ থেকে আগুনের নুড়ি নিয়ে ফুল গুলালকে তাড়া করে)

(দ্রুত গুলালের প্রবেশ)

গুলাল : ওগো আমায় রক্ষা করো গো। আমায় রক্ষা করো। উঃ তুমি কি করেছো সতিনের ঘরে এনে। এমনি করে আমার জীবনটা দগ্ধে দগ্ধে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে? তার চেয়ে তুমি আমাকে মেরে ফেলো। খোদার আরাধনায় বসেছিলাম। এই দেখো এই খানটায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। আর যে যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। বড় জ্বালা, না-না জ্বালা করছে না। সেরে গেছে। আমি আর কোনো ব্যথা তোমার জানাবো না। তোমার অন্তরে যে অঘাত লাগছে। আমি সমস্ত জ্বালা নীরবে সহ্য করবো। খোদা আমাকে সহ্য করার ক্ষমতা দাও। যাই এখান থেকে, এখানে থাকলে আগুন আরও দ্বিগুন তেজে জ্বলে উঠবে।

বেরাহিম : গুলাল শোনো, অথর্ব জীবনে যে টুকু বাঁকি ছিলো এইবার ষোলো কলায় পূর্ণ হতে বসেছে। সে জন্য তোমার এমতো অবস্থায় আমি আর কষ্ট দিতে চাই না। চলো তোমায় পিত্রালয়ে রেখে আসি। এখানে থাকলে তোমার সেবা শুশ্রূষার লোক হবে না। এবং তোমাকে হয়তো বাঁচাতে পারবো না। যাবে গুলাল?

গুলাল : তোমার কথাতো আমি কোনোদিন ফেলিনি। তুমি যা বলবে, আমি— আমি তাই করবো।

বেরাহিম : তবে চলো, আজই তোমার পিত্রালয়ে রেখে আসি। খোদা তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

(উভয়ে প্রস্থান)

(ফুল বিবির প্রবেশ)

ফুল : হাঃ হাঃ হাঃ, বাঁচলাম। আপদ গেছে না বেঁচেছি। এমন যদি কেহ ভেদ করবার ক্ষমতা কারো হবে না। ও মা-গো-মা—পতিভক্তা মানুষের মধ্যে থাকতে পারে? আঃ কথাটা তার মুখ দিয়েই কোনোদিন বেরুলো না। হ্যাঁ তার ঘরে ছেলে, যত্ন পাবে সে, আর আমি হতাদরে অনাদরে শেয়াল কুকুরের ন্যায় ঐ সতীনের ছেলের কাছে লাথি ঝেঁটা খেতে পারবো না। এখন আমি দিল্লির বাদশাহী গো— দিল্লির বাদশাহী। হাঃ হাঃ হাঃ।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(গুলাল ও ব্রাহিমের প্রবেশ)

গুলাল : পথ ছেড়ে এ বনের পথে এলে কেন স্বামী? এখানে তো জনমানবের সাড়া শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শুনি শুধু বন্যপশুর চিৎকার, চলো শহরের পথে যাই।

বেরাহিম : খোদা, খোদা, আমাকে বিচলিত করো না। আমি আমার মনোবাসনাকে যে ভাবে চালিতো করবো, সেই ভাবে যেন সত্যে পরিণত হয়।

শোনো গুলাল, সাদীর সময় আমার মানসিক ছিলো যে, তুমি গর্ভবতী হলে হজরত গাজীর দরগায় ধারশোধ করে যাবো। তাই এই অরণ্যে প্রবেশ করেছি।

গুলাল : আর কত দূর যেতে হবে স্বামী। আর যে আমি চলতে পারছি না। উঃ ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তুমি এইখানে একটু বসো। আমি তোমার কোলে মাথা রেখে একটু বিশ্রাম করে নিই, আমার দেহটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। (বেরাহিম বসিলে গুলাল তার কোলে মাথা রেখে ঘুমায়)

বেরাহিম : খোদা মঙ্গল করো। এই তো সময় হয়েছে জনমানবের সাড়া শব্দ নেই। (উঠিয়া) এই তো উপযুক্ত অবসর। এই বার আমি পালাই (প্রস্থানোদ্যত)

না, না, না— ভুল করছি। একবার যদি না ডাকি খোদার কাছে যে অপরাধী হবো। হ্যাঁ গুলাল এসো যাই। গুলাল এসো যাই। খোদা তুমি সাক্ষী রইলে। আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি। এইবার আমি পালাই।

অগ্রসর হইলো। একি! আমি চলতে পারছি না কেন? পৃথিবীটা কি ঘুরছে? এখন দীবা না রাত্রি? আমি কেন চক্ষে দেখতে পারছি না, নেশার গাঢ় অন্ধকার আমাকে জড়িভূত করে ফেলেছে। ওরে কে আছিস বিশ্ববাসী? আমাকে দেখে শিক্ষালাভ কর। দ্বিতীয় দ্বার গ্রহণ করলে তার পরিণাম কি ভয়ংকর। নিজ হাতে আমি হত্যা করে যাচ্ছি। নারী হত্যার কত পাপ সঞ্চয় হয়। বাল্মীকির রামায়ণে তা উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। সরে যাও, পথ ছাড়ো, আমাকে স্পর্শ করো না, দেখতে পাচ্ছ না। আমার সর্বাঙ্গে নারী হত্যার পাপকীট গুলো কেমন বিজ্-বিজ্ করে বেড়াচ্ছে। আমি এখন এই দুর্গন্ধ পুরি থেকে উঠে আসছি। ঐ চন্দ্র-সূর্য ছুটে চলেছে তীরবেগে— নদী ছুটে চলেছে

তার অজানার দেশে। অরুন্ধুতী নক্ষত্রের ন্যায় মনের নিভৃতি প্রান্তে যে উঁকি দিয়ে যায়। সেও আজ মলিন। ঐ যে জগৎটা আমায় ধিক্কার দিচ্ছে। জগতে সবাই পাগল হয়েছে। আমাকে দেখে সবাই হাসছে। হাঃ হাঃ।

(ভক্তমালার প্রবেশ এবং গীত)

গীত

ওরে পাগল ছেলে ফিরে আয়।
ওরে তুই ডুব দিয়ে যারে বাংলা মায়ের
রূপের দরিয়ায়—
ফুলে ফলে গন্ধে ভরা
রূপটি মায়ের পাগল করা।
স্বর্গ তোদের আকাশে নয়
এই মাটির আঙিনায়।

(প্রস্থান)

বেরাহিম : চল মন, মনোরথে হও অগ্রসর, বিশ্বাস ঘাতক ধ্বংসকারী বেরাহিম; চলেছে এবার স্বহস্তে নারীর শিরোচ্ছেদ করিয়া কল্লোলিত নদীগর্ভে করিতে নিঃক্ষেপ। চলো মন ধীরে-ধীরে পাষাণে ধরিয়া বক্ষ কর্তব্যের পথে হও অগ্রসর। (প্রস্থান)

গুলাল : (নিদ্রাভঙ্গে) এ্যাঁ— কৈ কোথায় গেলো স্বামী— স্বামী— তবে কি তুমি আমাকে ফাঁকি দিলে? না— না— বোধ হয় ঐখানে আছে। স্বামী— কৈ কোনোখানে তো সন্ধান পাচ্ছি না। সত্যই কি আমাকে ফাঁকি দিয়েছে? কি করি হায় হায়। আমার একি সর্বনাশ হলো। আজ হতে বুঝলাম এ দুনিয়ায় কেহ কাহারও নয়। এক দয়াময় ভিন্ন সবই মিথ্যা। সবই অলিক। হায় বিধি? তুমি বোধায় দুনিয়ার সমস্ত দুঃখকনা দিয়ে আমাকে গড়ে ছিলে। তাই যদি হয়, তবে এই অসময়ে আমাকে রক্ষা করো। অভয় দাও, তুমি ছাড়া আর কে আমাকে অভয় দেবে। কে আর আমাকে রক্ষা করবে। হায় খোদা পাকজাত রহিম রহমান। দয়ার সাগর তুমি, পাক ছোয়ানে তোমা বিনা কিছু নাহি জানি, জঙ্গলেতে বিপদে পড়েছি আল্লা তরাও মছিবতে। কৈ প্রভু এসো। এসো প্রভু। তুমি যদি এই অসময়ে পরিত্যাগ করো, তাহলে তোমার নামে কলঙ্ক হবে। সব অন্ধকার। ওরে জগৎ নিস্তব্ধ। বাতাস বইছে না, পাখিও ডাকে না, ফুলও ফোটে না, সব কর্মবিহীন। সব পঙ্গু, কেহ কাহারো নয়। কেহ কাহার দিকে ফিরেও চায় না। দয়াও করে না।

(জৈনীক হুরের প্রবেশ)

হুর : সত্যই বলেছো ভাই। অসময়ে কেহ কাহারো নয়। কেহ কাহারো দয়াও করে না, কেহ ফিরেও চায় না। সুসময়ের বন্ধু সকলেই হয়, অসময়ের বন্ধু সেই তিনি ছাড়া

আর কেহ নেই। তুমি আমার সঙ্গে এসো বোন, তোমার—তোমার কোনো কষ্ট হবে না। সুসময়ে তুমি সুসন্তানের জননী হবে। (গুলালের হাত ধরিয়া প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য

(বনবিবি ও জংগুলির হাত ধরে গুলালের প্রবেশ)

গুলাল : হায় বিধি। যদিও একটু আশ্রয় পেয়েছিলাম তারাও ফাঁকি দিয়েছে। সব ফাঁকির খেলা। জগৎটা ফাঁকি। তবে কার জন্য স্নেহ মমতা করি। এরাও একদিন আমাকে ফাঁকি দিয়ে যাবে। তোমরা এইখানে থাক। কেউ কারো নয়। কিছু চাই না। চোখ দুটি যে দিকে যায়, আমি সেই দিকে চলে যাবো। (প্রস্থান)

(মৃত সন্তান নিয়ে হরিণীর প্রবেশ।)

হরিণী : হ্যাঁ ভাই। তুমি এতই নিষ্ঠুর। এই দেখো আমি বনের পশু। আমার এই সন্তানটা ছয়মাস হলো মরে গেছে। তবুও তাকে বুকে করে নিয়ে জ্বালা জুড়াই। আর তুমি মানুষ, দু-দুটি সন্তান ত্যাগ করে চলে যাচ্ছো। তোমার অন্তর এতই পাষাণে গড়া?

গুলাল : সত্যই বলেছো ভাই। মানুষ ঘাত-প্রতিঘাতে নিষ্ঠুর হয়। দয়া-মায়াহীন পাষাণ হয়। এই জংগলে নিজের উদরপূরণ করতে পারি না। তার উপর এই দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে কি খেতে দেবো। আচ্ছা তার একটা কথা রাখি। ছেলেটাকে নিয়ে যাই। আর মেয়েটাকে রেখে যাই। যদি পরমায়ু থাকে তাহলে খোদাই ওকে রক্ষা করবে। (জংগুলীসহ প্রস্থান।)

বনবিবি : হায় খোদা ছিনু মোরা দুটি ভাই বোন, হলাম ভাইটি হারা। এই ছিলো আমার কপালে।

(গীতকণ্ঠে ভক্তমালার প্রবেশ)

গীত

কপাল মন্দ হলে, বন্ধু মন্দ বলে।
সম্বন্ধ রাখে না সহোদর ভাই।
বলেন পিতা-মাতা অসংগত কথা,
এ দুঃখ বারতা কাহারে জানাই।
ডেকে সুধায় না কোথা যাও পুত্র
এ দুঃখ বারতা কাহারে জানাই।
প্রতিবেশী যারা, কথা কয় না তারা
মুখ ফিরায়ে রয় প্রাণের বন্ধু যারা।

ডেকে সুধায় না— যাও বন্ধু কোথা,
মরমের ব্যথা কাহারে জানাই।

(বনবিবিসহ ভক্তমালার প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য

(জীর্ণ-শীর্ণ বেরাহিমের প্রবেশ)

বেরাহিম : গুলাল, গুলাল সাড়া দাও, কথা কও। গুলাল, কৈ কেউ তো আমার ডাকে সাড়া দিলো না। সমস্ত বন তন্ন-তন্ন করে খুঁজলাম। তবুও গুলালের সন্ধান পেলাম না। না— না— সে বেঁচে নাই। একে একে আজ সাতটি বছর কেটে গেলো। না খেয়ে সেকি আর বেঁচে থাকতে পারে? বনের হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে। উঃ খোদা, অন্ততঃ তার একটা হাড় পেতাম, তাহলে মনকে কিছুটা প্রবোধ দিতে পারতাম। এই, এই তো সেই বড় বট গাছটা গুলাল— গুলাল।

নেপথ্যে গুলাল (উপরে মঞ্চে গুলাল নিজে এক গাছের নিচে বসে আছে)

গুলাল : স্বামী

বেরাহিম : গুলাল

গুলাল : স্বামী

বেরাহিম : ঐ যেন কার কণ্ঠের স্বর শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, যেন বহু দিনের পুরানো স্বর। বোধায় আমার গুলালের কণ্ঠস্বর। গুলাল।

(নেপথ্যে)

গুলাল : স্বামী

বেরাহিম : দয়াময় খোদা। তুমি আমার বাসনা পূর্ণ করো। শুধু একটিবার ক্ষণিকের তরে চোখের দেখা। গুলাল— গুলাল (উপরের মঞ্চ থেকে) দ্রুত প্রস্থান।

(জংগুলির হাত ধরিয়া গুলালের প্রবেশ)

গুলাল : হায় বিধি। কেন বনে এলাম। আজ তিন দিন হলো একটি ফল পর্যন্ত পেলাম না। কি করে ছেলেটাকে বাঁচাই। আর যে চলতে পারছি না। নিজে মরি তাতে ক্ষতি নেই। ছেলেটাকে যে হাতে করে মেরে ফেললাম। হায় হায়, এখন আমি কি করি। হায় বিধি সত্যই কি আমার কেহ নাই।

(ব্রাহিমের প্রবেশ— উপরের মঞ্চ থেকে)

বেরাহিম : হ্যাঁ-হ্যাঁ আছে আছে সেই বিশ্বদুনিয়ার মালিক আছে। আর আছে তারই প্রেরিতো নরাকারে দ্বিপাদপশ্য। বিশ্বাস ঘাতক এই ব্রাহিমের যম্। সেই আমার উপরে বড় নির্দয় ভাব ধারণ করেছে। আমি এমন পাপী যে, যম পর্যন্ত আমার কাছে আসতে সাহস পায় না। বনের শৃগাল, কুকুর গুলো ঘৃণায় নিবিড় বনে পলায়ন করে। তুমি আমায় ক্ষমা করো গুলাল। আমি তোমার নিকট কোটি কোটি অপরাধে অপরাধী। আর তুমিও এসো পুত্র। সারা জীবনের স্তূপিকৃত জ্বালা কিছুটা উপশম করি।

(জংগুলিকে নিলো)

গুলাল : স্বামী তুমি কি নিষ্ঠুর। তুমি কি পাষাণ। তোমার অন্তরে বিষ, মুখে মধু। তবে কেনো আর চাতুরী। উঃ স্বামী— তুমি কি এতই নিষ্ঠুর। এই অচ্ছেদ্য ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করে, আজ সাতটি বছর তুমি কেমন করে ফাঁকি দিয়ে ছিলে। অতি ভালোবাসার পরিণাম কি এই রূপ ধারণ করে?

বেরাহিম : গুলাল, তুমি আর আমাকে অপরাধী করো না। আমার অন্তরটা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমার রসনায় এমন কোনো ভাষা নেই, যে উপমা দিয়ে তোমাকে প্রকৃতিস্থ করবো। সব হারা হয়েছি। সব অজানার দেশে চলে যাচ্ছে, ভুল সব ভুল। সব এলোমেলো। সবই যেন ভুলে পরিণত।

গুলাল : দেখা শুনাতো হলো, এবার তুমি যেতে পারো। আর আমি দেশে যাবো না। আবার হয়তো কোনো শাস্তি দেবার জন্য তোমাকে পাঠিয়েছে। আমার জীবন যখন দুঃখে গড়া, তবে সুখ আর চাই না। কোন অপরাধে তুমি আমাকে এমন শাস্তি দিলে?

বেরাহিম : তোমার কোনো অপরাধ নয় গুলাল। সব অপরাধ আমার। ডাকিনীর মোহজালে পড়ে সত্যে আবদ্ধ হয়েছিলাম। সেই সত্য রক্ষার জন্য তোমার বনবাস। হিন্দু-শাস্ত্রে মহাভারতের কথা স্মরণ করে দেখো গুলাল, এই সত্য রক্ষার জন্য পৃথিবী বিজয়ী দানবীর কর্ণ, নিজের ঔরষযাতো সন্তান বৃষকেতুর মাথা স্বামী-স্ত্রীতে স্বহস্তে ছেদন করে অতিথি সেবা করেছিলো।

তাই বলছি— অভিমান করো না। দিবা অবসান প্রায়, হয়ে আসে গাঢ় অন্ধকার। হাত ধরো মোর, ক্রমে ক্রমে হই অগ্রসর।

(প্রস্থানোদ্যত)

(দ্রুত বনবিবির প্রবেশ।)

বনবিবি : কোথা যাও ভাই জঙ্গুলী। মা-বাপের সঙ্গে আর আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বাদাবনের আঠারো ভাটিতে হবে আমাদের জহুরা। এসো ভাই, আমার কাছে এসো। আমরা দেশে ফিরে যাবো না।

গুলাল : ওরে বাছা দশ-মাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেছি। বহু কষ্টে মানুষ করেছি তোদের। দুনিয়াতে অভাগিনীর আর কেহ নেই। শেষ কালে আমাকে ফাঁকি দিবিরে।

বনবিবি : দোষ দিও না মা। খোদা যাহা করেন সবই ভালোর জন্য করেন।

বেরাহিম : সেই জ্বালা, সেই বুকভরা বেদনা, এজীবন আর জুড়াবার মতো হলো না। জ্বলবে, জ্বলবে, সারা জীবনটা শুধু জ্বালাতেই আছে। জ্বালাও, জ্বালাও আরও যদি

জ্বালাবার মতো থাকে তীব্র বিষ। তবে করো উদ্‌গীরণ। আমি বুক পেতে দিচ্ছি। এক নিমেসে এসে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলো। সব নিভে যাক, হোক অবসান।

বনবিবি : দুঃখ করো না বাবা। সংসার অসার। কেউ কারো নয়। দুদিনের অভিনয় করতে এসে যদি তোমাদের স্নেহে মমতায় ভুলে থাকি, তবে হিসাবের কালে কি বলে জবাব দেবো। তাই বলছি বাবা, খোদার নাম করতে করতে দেশে চলে যাও।

বেরাহিম : ঐ সন্ধ্যা নেমে আসে। ভাস্কর চলেছে ধীরে ধীরে অস্তাচলে। চলো মন ধীরে ধীরে। আগুন্তক ইশারায় দেখা যাচ্ছে পথ। এরপর যাওয়া হবে ভার। সব একাকার, ভুল সবি ভুল। জীবনটা শুধু একটা ভুলের ফসল।

গুলাল : সবি মিথ্যা, সবি অলিককল্পনা, কুহাকে পড়ি আলিঙ্গন। বদ্ধ জীব তাই পায় দেখিতে পর-পারের আলো। ধন্য আমি আর ধন্য তোদের পিতা। তোদের মতো সন্তান সন্ততিকে জঠরে ধারণ করে জীবন ধন্য হলো মোদের। আশীর্বাদ করি, তোমরা সকার্য্যে জয়ী হও। আর বিশ্বের পাতায় পাতায় তোমাদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাক, অজয়— অমর হয়ে।

(বেরাহিম ও গুলালের প্রস্থান)

বনবিবি : চলো ভাই। মদিনাতে যেতে হবে মুরিত হইতে। তারপর ফতেমার গোরে জিয়ারৎ করতে হবে।

(প্রস্থান)

দ্বি তী য় অং ক

প্রথম দৃশ্য
ধনার প্রবেশ

ধনা : মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। মৃদু-মন্দ বহিতেছে মধুর সমীরণ। সুখশয্যায় লভিনু শয়ন। নিদ্রাঘোরে হেরিতেছি স্বপন। কে যেন কহিলো আমারে, যাও ধনা সপ্ততরী করি সুসজ্জিত মহালেতে করহো গমন। কেন হেনো হেরুণ স্বপন। তবে সত্য হবে স্বপনের বাণী। খোদা ভালোমন্দ দোষগুণ কিছুই নাহি জানি। করিয়াছে হুকুম কেমনে বান্দাতা করিবে পালন। কোথা পাবো সপ্ততরী লোকজন এতো। কেমনে হইবো পার অপার দরীয়া।

মনোহর : দাদা, দাদা, এমনি করে সুকাসনে বসে বসে; রমণীর গলকণ্ঠে মন প্রাণকে নিমর্জ্জিত করে আর কতদিন কাটাবে ভাই।

ধনা : এসো ভাই। আমিও তাই ভাবছি। এমনি করে বসে বসে খেলে আর কতদিন চলবে। তাই বলছি আমাদের পূর্ব পুরুষের ব্যবসা বনে যাবো। বন থেকে মোম-মধু সংগ্রহ করে শহরে এনে বিক্রয় করবো। তাতে অনেক টাকা লাভবান হওয়া যাবে। তুমি যাও ভাই। সত্বরে সাতখানা বাণিজ্যতরী এবং চোদ্দগণ্ডা লোক সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। বসন্তকাল উপস্থিত। এই বসন্তের শেষ ভাগে অর্থাৎ চৈত্রমাসে হবে মধুর সৃজন। আমাদের অতি সত্বরে যেতে হবে ভাই।

মনোহর : না, দাদা! তুমি আর অন্য কোনো ব্যবসা করো। তাতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু ঐ মহল ব্যবসায় আমার আদৌ মত নেই। আমি বলছি তুমি ঐ মত ত্যাগ করো।

ধনা : তুমি আমায় বাধা দিও না ভাই। নিশিতে হেরিছি স্বপন, মহলেতে করিলে গমন, হইবে ফল-ধন উপার্জন।

মনোহর : একটি গাছে দুটি কমল মোরা, জানি না কে অকালে রাহু কর্তৃক হইবে চয়ন। বনে কতো হিংস্র জন্তু ফেরে অনিবার। কেন যাবে তাদের সম্মুখে ভাই।

(গীত)

মহলেরী কথা ধনা— বলো নাকো আর
মহলেতে গেলে ধনা— না ফিরিবে দেশেতে আর
শুনেছি সেই গহন বনে— বাঘ ভাল্লুক আছে অনেক,
বনের কথা মনে হলে— দুরু দুরু কাঁপে অন্তর।

ধনা : তুমি আমায় যতই বাঁধা দাও না কেন। আমি মহল যাত্রা করবোই। তুমি যাও ভাই সত্বরে সাতখানা বাণিজ্যতরী এবং চৌদ্দগোণ্ডা লোক সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। আমি দেখে আসি কোথাও টাকা-পয়সা পাওয়া যায় কিনা। (প্রস্থান)

মনোহর : খোদা জানি না কিবা অভিপ্রায়। ছিনু মোরা দুটি ভাই? কোনো প্রকারে সংসার নির্বাহ করছিলাম। কিন্তু তার মধ্যে যদি হই ভাইটি হারা, তাহলে আমি বাঁচবো? তাইতো এ আমি কি বলছি। এতো আমাদের পূর্ব-পুরুষের ব্যবসা এবং বংশগত ধারা। না— না— আর মিছে চিন্তা করে মন খারাপ করবো না। দেখি কত দুর কি করা যায়। (প্রস্থান)

(গীতকণ্ঠে মাঝিগণের প্রবেশ)

(গীত)

মানিক পির ভবনদীর পারে যাওয়ার নাও
কদু-কুমড়া রইলো ফেলা খোদা তুচ্ছ নাইবার বেল,
আজগুবী দুনিয়ার খেলা খোদা সর্য্যার মধ্যে ত্যাল।
কতকীর্তি রইলো ফেলা খোদা কহনে না যায়—
মাজা দুলাইয়া গুলালবিবি পানি আনতে যায়।

(মনোহরের প্রবেশ)

মনোহর : ঐ তো কতক গুলি লেয়েমাঝি এদিকে আসছে। এদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখি, এরা মহলে যেতে পারে কিনা। (প্রস্থান)

(মাঝিগণের প্রবেশ)

(গীত)

মানিকপীর ভবেনদীর পারে যাওয়ার নাও
কদু-কুমড়া রইলো ফেলা খোদা তুচ্ছ নাইবার বেল,
আজগুবী দুনিয়ার খেলা খোদা সর্য্যার মধ্যে ত্যাল।
কতকীর্তি রইলো ফেলা খোদা কহনে না যায়,
মাজা দুলিয়া গুলালবিবি পানি আনতে যায়।

মনোহর : ওহে মাঝিগন, তোমরা মহলে যেতে পারবে?

রহিম : হ্যা! কি কথে চাও?

মনোহর : তোমরা মহলে যেতে পারবে?

রহিম : বাহের প্যাটে? মরণ বুঝি আর খুঁজে পাচ্ছো না?

আলগাজ : এই ফেরাজ ও কয় কি? এ্যাঁ বাহের প্যাটে?

মনোহর : মহলে গেলে লোক মরে নাকি?

রহিম : না— না তা আর মরবে ক্যান? হাতেম চাচার যায়ে পড়নি কিনা, তাই এ কথা কথে চাও।

মনোহর : তোমাদের ইচ্ছা না হয় তোমরা যেও না। কিন্তু তোমরা চটছো কেন? আমি তোমাদের মাগনা নিয়ে যাবো না। রীতিমতো টাকা দেব।

ফেরাজ : ও তাই কতে হয়। রীতিমতো টাহা দিমু। টাহায় বাহের দুধ মেলে বুঝলে টাহায় বাহের দুধ মেলে।

(সাধুর প্রবেশ)

সাধু : এই আলার পো ব্যাটা আলারা। তোরা সব কি নিয়া গণ্ডোগোল করচিস। মোদের বাড়ীতে একটা ভদ্দরলোক আইচে, তাহে বসবার জায়গা না দিয়া, সব গণ্ডোগোল করচিস। যতসব গণ্ডোমুক্কের দল। হালায় দিমু, আলারা হালায় দিমু। ভাইটি তো ভালো কথা কইছে। ও মনোহর ভাই, এহানে বহেন বহেন। কি— কি কয়চেন, কহেন তো দেহি।

মনোহর : মহলে যাওয়ার কথা বলছি, আর তোমার লোকজন সব চটে উঠেছে। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো তো দেখি। আমার বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সাধু : এ রহিম, এই ফেরাজ, তোরা এহানে শোন, তোরা গণ্ডোগোল করচিস ক্যান। ভাইডি তো ভালো কথা কইচে। মহলে গেলে বড় বড় মাছ খাওয়া যাবে। তাড়িফল খাওয়া যাবে। মধু খাওয়া যাবে। আর দস্তুর মতো টাহা পাওয়া যাবে। যাবি না ক্যান কহাতো দেহি?

আলগজ : এই সাধুবাই বুড়ো বয়েসে তোর দেখছি খাওয়ার লোভ হয়েচে। তা তুই মহলে যা, আমার বিবি যে আমাকে একদিন না দেখলে থাকতে পারে না। বিবিকে রেখে আমি যাইমু-না। (প্রস্থানোদ্যত)

সাধু : এই আলগজ এ দিহে শোন— শোন, এদের কি কবু কহেন তো দেহি। এই সব গণ্ডমুক্কু নিয়ে আমাকে বাদায় যেতে হবে। এই আলগজ, বিবির মুখ দেখলে খাওয়া হবানে তো? কিছু টাহা কড়ির তো দরকার?

ফেরাজ : হ— হ, টাহা কড়ির দরকার।

সাধু : তবে কইলি যে মহলে যাইমু না।

রহিম : এই সাধু বাই তাহলে ভালো ক-হয়া, এটা টাহা কড়ির চুয়ান-ফুরান কইরা

লে। পরে যেনো গন্ডোগোল না হয়।

সাধু : তাই ক-হয়, যে ভালো কইরা টাহা কড়ির গুন কর।

ফেরাজ : ও মনোহর বাই, কত কি দেবেন কহেন তো দেহি।

মনোহর : তোমরা কত কি নেবে বলো।

সাধু : বাহারে টাহার ক-হয়া তো কেউ কয় না।

মনোহর : যাক— তোমরা ত্রিশ টাকা করে নিও।

রহিম : আরে ত্রিশ টাহা নিয়ে কি করমু। কহানে রাখুম?

মনোহর : তাহলে তোমরা একটা হিসাব করে বলো কত নেবে।

সাধু : ভালো কোথা হইচে, এই আলগজ এটা হিসাব ধরতো দেহি।

আলগজ : দেড় টাহা, দেড় টাহা, সাতসিয়া, তার নেই পাঁচ সিয়া। তাহলে কত হইলো? লয় সিহা।(২)

ফেরাজ : ও মনোহর বাই, এই লয় সিয়া করে দিতে হবে। বুঝলে?

মনোহর : দিনে না মাসে?

রহিম : আরে মাসে— মাসে। মাস শ্যাস হলে এই লয় সিহা করে দিতে হবে। বুঝলে?

মনোহর : এই জন্য তোমাদের ঘরে ভাত থাকে না।

রহিম : কি? আমাদের ঘরে ভাত থাক আর না থাক, তাতে তোর কি?

(মাঝিরা মনোহরকে মারতে যায়)

মনোহর : সাধু বাই ধর ধর।

সাধু : এই আলার পো ব্যাটা-আলা, মাইরা সব ভুত বানাবো।

রহিম : তুই রাখ তো সাধু বাই। আমি একটু রহনের ত্যাজ দেহিয়া দেই।

(মারতে উদ্যোত সাধু ঠেকাতে যায়)

মনোহর : সাধু ভাই, এই টাকা গুলি ধর।

সাধু : আরে রাহেন তো আপনার টাহা, কোথায় কি কথে হয় জানেন না। জানেন তো এটা খাজ্রে পাড়া। এই আলারা হালায় দিমু, সব হালায় দিমু। সব এহানে খারা হয়ে দারা। গন্ডোগোল করিস ক্যান। দারা— দারা, সব দারা দেহি, মনোহর বাই কি কইচে শোন। ও মনোহর বাই, কি কইছেন কহেন দেহি?

(রহিম, ফেরাজ ও আলগজ এক জায়গায় খারা হয়ে দাঁড়ায়, রহিম মাঝে মাঝে মারতে উদ্যোত হয়। ফেরাজ ও আলগজ রহিমকে ধরে। রহিম মাঝে মাঝে বলে, আমাদের ঘরে ভাত থাক আর না থাক তাতে ওর কি?)

মনোহর : সাধু ভাই এই দশ টাকা বায়না দিয়ে গেলাম। তুমি আগামিকাল সকালে লোকজন নিয়ে, বরিজ হাটি ধনাই মহলের বাড়ী যাবে।

(প্রস্থান)

(রহিম, ফেরাজ, আলগজ খর খর পায়ে মনোহরের দিকে তেড়ে যায়।)

আলগাজ : এ সাধু বাই, ও কি কয়ে গেলো, মরিচ হাটি যেতে হবে?

সাধু : আরে না— না— মরিচ হাটি লয়, বরিজ হাটি।

সকলে : হ-হ-বরিচ হাটি।

রহিম : সাধু বাই মোদের টাহা দে।

সাধু : আরে বাড়ি যাইয়া, মোরগা বিবির হাতের খানা খাইয়া, কাগজ কলম লইয়া ভাগ কইরা দেবানে।

সবাই : তাহলে মোরা যাইমু না।

(সবাই চলে যাচ্ছিলো, সাধু ধরে আনে।)

সাধু : বাদায় যাওয়ার লোক হচ্ছিলো না। এহন টাহা দে। তোরা যাস্ কনে। তোরা সব খারা হয়ে দারা। এই আলগজ তুই এদিকে খারা হয়ে দারা, গুরা গুরি করিস না। এই ফেরাজ তুই এদিহে খারা হয়ে দারা। দারা— দারা একটু তারাতারি গুইরা দারা। এ রহিম তুই টাহা নিবি নে?

রহিম : না— নিমু না। তুই নিলে হবানে। আমার তো আর মাগ স্বাওয়াল নেই।

সাধু : তাহলে তুই এদিকে গুইরা দারা। তুই যেন গুরা— গুরি করিসনে। এই আলগজ টাহা লে, এই তোর এট্টা। আর এই দেখ, এই মোর এট্টা এহানে রইলো। অইলো তো।

আলগজ : হ— হ— অইলো।

সাধু : দারা— দারা এবার ঘুইরা দারা। এই ফেরাজ টাহা নিবে নে?

ফেরাজ : না টাহা লিমু না— মহলে যাচ্ছি— টাহা লিমু না। তুই নিলে হবান।

সাধু : লে— লে— টাহা লে। এই তোর এক্কান আর এই দ্যাখ মোর এক্কান। এই এহানে রইলো। বাড়ী যাইয়া আবার যেন গন্ডোগোল করিসনে। দারা ঘুইরা দারা, এই রহিম লে— টাকা লে। এই তোর এট্টা, আর মোর এট্টা রইলো। অইলো তো। তুই বড় গন্ডোগোল করিস, টাহা বাক আইলো তো?

রহিম : হ্যাঁ। অইলো। ভালো তিনটে গন্ডোমুক্ক পাইছিস।

সাধু : বাড়ী যাইয়া যেন গন্ডোগোল করিস না।

রহিম : না— না— গন্ডোগোল করবো ক্যান। তুই এহানে খারা হয়ে দারা। বুরা বয়েসে তোর টাহা ভাগ করা দেহিয়ে দিই।

সাধু : (মিহি সুরে) এ রহিম রাগ করিস ক্যান। আইলো কি?

রহিম : এই সাধু বাই— প্যাচ-প্যাচ করিসনে— সোজা হয়ে দারা।

ধরে দাঁড়িয়ে দেয়, সাধু ভয়ে কাঁপতে থাকে।

এই আলগজ বাই, তুইতো বললি আমার না দেখে থাকতে পারিনে। টাহা বাক

করা হইলো তো?

আলগজ : হ— হ অইলো।

রহিম : অইলো। এইটা অইলো আস্ত বন কচু। এই টা-দে, দে টাহা গুরাইয়া দে।

সাধু : (ফেরাজের নিকট যাইয়া) এই ফেরাজ কি অইলো রে।

রহিম : এই সাধু বাই, কি অইলো— আমি দেহাচ্ছি। তুই এহানে খারা হয়ে দারা। আর তা না হলে (দাড়ী ধরে) এই দেহিছি তো— বুরা বয়েসে এক্কান এক্কান করে বেচে ফেলবানে। এই ফেরাজ টাহা বাগ করা অইলো তো?

(সাধু ভয়ে আলগজের নিকটে গিয়ে)

সাধু : এই আলগজ কি অইলোরে, মোর টাহা বাক করা অইলো না?

রহিম : এই সাধু বাই তুই পাহা মাঝি তোর টাহা বাক করা অইবে না। তোর তো কইছি এহানে খারা হই দারা। বুরা বয়সে টাহা বাক করা দেহাচ্ছি। দারা এহানে খারা হয়ে দারা।

(গলা ধরিয়া দাঁড় করিয়া দিলো)

এই ফেরাজ টাহা বাক করা অইলো।

ফেরাজ : হ্যাঁ অইলো।

রহিম : অইলো (২) টাহা বাক করা অইলো কেমন? এটা একটা গণ্ডমুক্ক। এই দে-দে টাহা গুরাই দে-দে। এই সাধু বাই টাহা দে, দে গুরাই দে।

সাধু : ক্যান কি হইছে এ রহিম?

রহিম : দে টাহা গুরাই দে। কি হইচে দেহাচি, বুরা বয়সে তোর টাহা বাক করা শিঁহাইয়ে দিই— দে টাহা গুরাই দে।

সাধু : এই নে। (টাকা দিলো)

রহিম : এই আলগজ বাই টাহা লে। তোর এট্টা আর মোর এট্টা। মোর কয়টা হইলো। কতো দেহি।

রহিম : এই ফেরাজ টাহা লে। এই তোর এক্‌কান আর মোর এক্‌কান। মোর কয়টা আইলো

ফেরাজ : মোর দুইটা অইলো।

রহিম : এই সাধু বাই টাহা লে। তোর এট্টা আর মোর এট্টা এহানে। এই আলগজ বাই মোর কয়টা অইলো?

ফেরাজ : মোর তিনটা অইলো।

রহিম : বেশ তিনটে গন্ডমুক্ক পেয়েচো!

(সাধু ভয়ে কাঁপে)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ধনার প্রবেশ

ধনা : স্বপ্ন সত্য, স্বপ্ন সত্য তা নাহলে আমার এতো আগ্রহ কেন? খোদার ইচ্ছায় টাকা পয়সার অভাব হলো না। কিন্তু মনোহর এখনো আসছে না কেন। না— না ঐ তো মনোহর আসছে। মনোহর— মনোহর— তোমার লোকজন সব ঠিক এসেছে তো ভাই?

(মনোহরের প্রবেশ)

মনোহর : হ্যাঁ দাদা, লোকজন সব ঠিক হয়েছে। কিন্তু আর একটা লোকের অভাব আছে। কাউকে যে খুঁজে পেলাম না।

ধনা : একটি লোক না হয় আমি খুঁজে আনছি। তুমি লোকজন নিয়ে জিনিসপত্র সব নৌকায় তুলে ফেলো।

মনোহর : দাদা, এতো টাকা তুমি কোথায় পেলে?

ধনা : জমিদারের বাড়ী গিয়ে বলতে জমিদার বলেন— যে ধনার ঘর পোড়ালে একমুষ্ঠি ছাই হয় না। চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজনের টাকা দিলে ধনা পরিশোধ করবে কি করে? কিন্তু আমলা বললেন শুনেছি মধু নাকি অমূল্য দরের জিনিস। কবিরাজের ঔষধের অনুপান করতে এক ফোটা মধু পাওয়া যায় না। আপনি টাকা দিন। ওর কাছে থেকে না হয় মধু নিয়ে টাকা পরিশোধ করে নেবো। বলিতে জমিদার টাকা দিলেন, হ্যাঁ ভাই তুমি আর দেরি করো না। আমি এখনি আর একটা লোক নিয়ে আসছি। (প্রস্থান)

মনোহর : একি হৃদয়। তুমি মর্মতন্ত্রী ভেদ করে এমন করে দুরু দুরু করে কেঁপে উঠছো কেন? যেন মনে হচ্ছে কোনো এক বেদনার স্মৃতি আমার হৃদয়রাজ্যটা উলোট পালোট করে দিচ্ছে। না— না— আর মিছে চিন্তায় সময় নষ্ট করবো না। যা হয় হবে। খোদার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক— খোদার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(বিবিজানের হাত ধরিয়া দুখের প্রবেশ)

দুখে : মা, আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে। আমায় কিছু খেতে দাও না মা।

বিবিজান : এখন তোকে কি খেতে দিবো বাবা। ঘরে একটি দানা নেই। এখন ওদের বাড়ীতে যাবো। ধান ভেনে শীঘ্র বাড়ী ফিরে আসবো। তুই ততক্ষণে এই খাবার গুলি খেতে থাক। আমি এখনই ফিরে আসবো।

(প্রতিবেশীর প্রবেশ)

প্রতিবেশী : দুখের মা, বাড়ীতে আছো, দুখের মা?

দুখে : ঐ শোনো মা, কে তোমাকে ডাকছে।

প্রতিবেশী : কি দুখের মা। তুমি আমাদের বাড়ীতে ধান ভানবে বলে চাউল নিয়ে এলে। কিন্তু আর গেলে না কেনো বলোতো? বেটী বড় চালাক হয়েছো তাই না? কেন আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বললে? তুমি যাও বলছি যাও। এখন ছেলে নিয়ে আবদার করা হচ্ছে?

দুখে : কে গো তুমি— আমার মাকে অমন কথা বলছো?

প্রতিবেশী : চোপরাও পাজী ছেলে। (চপেটাঘাত)

দুখে : মা— মা—

বিজান : বাপ দুখে কিছু বলো না। আমরা যে কাঙাল গরীব। গরীব লোকদের, ধনী লোকদের কাছে অনেক কথাই শুনতে হয়। ওরে বাপ— ওদের কথায় রাগ করলে তোকে আর বাঁচাতে পারবো না বাপ দুখে।

প্রতিবেশী : কি দুখের মা, কিছু বলছো না যে?

বিজান : হ্যাঁ এই আমি যাচ্ছি। আমার একটি মাত্র ছেলে, তাকে কিছু খাবার দিয়ে আমি এখনি যাই।

প্রতিবেশী : আচ্ছা দেখা যাবে। আমি এই চললাম।

(প্রস্থান)

বিজান : বাপ দুখে, তুমি বাড়ি থাকো, আমি যাই।

দুখে : না— মা, তুমি যেও না, ওরা হয়তো তোমাকে মেরে ফেলবে।

বিজান : তাই কি আমার কপালে হবে। তা হলে তো আমি বাঁচতাম।

দুখে : না— মা, তুমি মরোনা। তুমি মরলে আমি কার কাছে থাকবো? কার আঁচল ধরে মা খেতে দাও, মা খেতে দাও বলে ডাকবো?

বিজান : তবে তুমি বাড়ীতে থাকো, আমি যাই, অবার এখনি ফিরে আসবো।

(প্রস্থান)

দুখে : হায় খোদা, অন্নকষ্টের চেয়ে বোধহয়, দুনিয়ায় আর অধিক কষ্ট নেই। আমি পূর্ব জন্মে কি মহাপাপ করেছিলাম যে, এ জন্মে তার কর্মফল ভোগ করতে হচ্ছে।

(গীত)

এদেহ ত্যাগ করোরে প্রাণ— খেওনা আর দানাপানী
আমার জন্য, মা জননী শুনিলেন আজ কটুবানী।
মায়ের কাছে আর যাবো না— ক্ষুধা পেলে মা আর চাবো না
ক্ষুধার দায়ে প্রাণ ত্যাজিবো— বাঁচবে আমার মা জননী।

(ধনার প্রবেশ)

ধনা : কত বাড়ী চেষ্টা করে এলাম, কেহ তা স্বীকার করে না। যা হোক একটা ছেলে ছোকরা পেলেও হতো। কি করি। কোথায় পাই। ওঃ ঠিক হয়েছে। এখানে আমার এক পালিতো ভাইয়ের ছেলে আছে। তার নাম না কি দুখে। দেখে যাই যদি ছেলেটা হয়। তাহলে আমার বড়ো উপকার হয়। দুখে— দুখে, বাড়ীতে আছো— বাপ দুখে?

দুখে : কে— আপনি আমাকে ডাকছেন? আমি আপনাকে চিনিনে।

ধনা : তা বাবা চিনবে কেমন করে। অনেকদিন হলো তোমাদের এখানে আসিনি। তোমার বাপজান আমার খালাতো ভাই হয়।

দুখে : তাহলে আপনি আমার চাচাজী । বসুন বসুন চাচাজী, আমার ছালাম গ্রহণ করুণ। (ছালাম করিলো)

ধনা : (বসিয়া) বাপ দুখে, তুমি তো অনেক বড়ো হয়েছো দেখছি। তোমাদের সংসার চলে কি করে?

দুখে : গরীবের কথা শুনে কি হবে চাচা?

ধনা : দেখি, যদি কোনো উপকার করতে পারি।

দুখে : তাহলে শুনুন চাচাজী।

গীত

শুনো বলি চাচা আমার দুঃখের কথা কি বলিবো আর,
কপালেরি ফেরে চাচা পরের গরু রাখি এবার।
মা যে আমার ভাঁড়া ভানে— খুদকুঁড়া চাল মেঙে আনে,
কখনো খাই— কখনো খাই না চাচা দুখে জীবন গেলো আমার।
ঘরে দানা নাহি ছিলো, বাপজী আমার মাগুত হলো
বিহালেতে ফেলে গেলো চাচা, ভাসীতেছি তাই অকুল পাতায়।

ধনা : তাহলে তো তোমাদের অনেক কষ্টে দিন যাচ্ছে। তোমার মা তবে এতোদিন বলেনি কেন। আর তুমি এতো বড়ো হয়েছো, শুধু লোকের গরু চরিয়ে খাও। তা আর কি করবে, কোনো কাজ কর্ম তো জানো না। আর কে বা শিখাবে। এক কাজ কর দুখে— তুমি আমার সঙ্গে চলো। তোমাকে ব্যবসা বাণিজ্য শিখায়ে বিয়ে সাদী দিয়ে দেব। যাবে দুখে?

দুখে : হ্যাঁ যাবো চাচাজী। আমার মাকে আর ধান ভানতে হবে না তো? আমার ব্যবসা বাণিজ্য শিখাবেন তো চাচাজী?

ধনা : হ্যাঁ শিখাবো, তুমি এক বছরে অনেক টাকা উপায় করতে পারবে। যদি তুমি ব্যবসার কাজ শিখতে পারো।

দুখে : কেনো পারবো না। আপনারা শিখেছেন আর আমি কেনো পারবো না। কিসের ব্যবসা বলুন না চাচাজী?

ধনা : এই বন থেকে মোম-মধু সংগ্রহ করে নিয়ে, শহরে এনে বিক্রয় করা। তাতে অনেক টাকা উপায় হয়।

দুখে : তাহলে আমি আমার মাকে ডাকি। মা— ও— মা একবার বাড়িতে এসো।

(বিবিজানের প্রবেশ)

(গীত)

বারে বারে ডাকো কিসের দায়
আমি এই রেখে গেলাম তোমায়
সকাল বেলায় গেছিলাম পাড়ায়
ভাঁড়া না ভানিলে যাদু, অমনি কেবা দেয়।
ও আমি ভাঁড়া ভানি দুঃখ করিরে,
ও যাদুধন তোরি দায়।

দুখে : মা— মা— দেখ, আমার চাচাজী এসেছে। আমি চাচার সাথে মোম-মধুর ব্যবসা শিখতে যাবো।

বিজান : সে কি কথা বাবা, এখন কে তোর চাচাজী হয়ে এলো? তুই গর্ভে থাকতে আমি বিধবা হয়েছি। আজ পর্যন্ত আপনার বলে কেউ দুটি দানার সাহায্য করেনি। আর আজ তুই চাচা পেলি কোথায়। তোকে মোম-মধুর ব্যবসা শিখতে হবে না। আমি তোকে দেশে গাঁয়ে ভিক্ষা করে খাওয়াবো। তুই বাড়ী থাক।

ধনা : শোনো ভাবিজী দুখে পুরুষ বেটা ছেলে, কতদিন ওকে আর ঘরে বসিয়ে রাখবে। তার চেয়ে ছোট থাকতে আমার কাছে দাও। আমি ব্যবসা বাণিজ্য শিখায়ে দেবো।

বিজান : না— না— তা হবে না, আমি ওকে বনে যেতে দেবো না। আমি ওকে দেশে গাঁয়ে ভিক্ষা করে খাওয়াবো।

ধনা : মেয়ে লোক কিনা। সাধে কি বলে মেয়ে লোকের এক পোয়া বুদ্ধি কম। দুখে তুমি তাহলে থাকো, আমি চললাম। (প্রস্থানোদ্যত)

দুখে : না— দাঁড়ান চাচাজী, আমি আমার মাকে একবার বুঝিয়ে বলি। মা তুমি বাঁধা দিচ্ছো কেনো? চাচাজী বলেছেন আমরা বড় লোক হবো। আর আমার বিয়ে সাদি দিয়ে দেবে। সত্যি তো চাচাজী?

ধনা : হ্যাঁ সত্য।

দুখে : ঐ শোনো মা, উনি আমাদের পরম আত্মীয়। তুমি বলো মা। আমি চাচার সাথে যাই।

বিজান : আমি কেমন করে বলবো বাবা। ওরে তুই যে আমার নয়নের মনি। আঞ্চলের ধন জীবনসর্বস্ব। উঃ বিধি এই কি আমার ললাটে লেখা।

ধনা : ভয় কি ভাবিজী। আমি ওকে নিজের ছেলের মতো সাবধানে রাখবো।

দুখে : তোমার কোনো ভয় নেই মা। আমার খুব সাহস হচ্ছে।

(গীতকণ্ঠে ভক্তমালার প্রবেশ)

মা— গো— মা তোমায় করি মানা,
দুখিনির ধন বনে দিও না।
দুখিনির ধন বনে গেলে কেমনে বাঁচিবে মায়ে,
হায় হায় এ দেহেতে প্রাণ রবে না।
দেখো রামচন্দ্র বনে গেলো—
মায়ের দশা তার কি হইলো।
পুত্র হারা হয়ে কাঁদে কৌশল্যা মায়ে।

(প্রস্থান)

দুখে : তুমি ওর কথা শুন না মা। তুমি একটি বার বলো মা আমি যাই।

বিজান : তবে নিয়ে যাও ধনা, দুখেরে আমার। হাতেতে সঁপিয়া দিলাম আমি— দুখেরে তোমার।

(গীত)

দেখো ধনা আমার দুখে যেন কাঁদে না,
দুখে আমার অবোধ ছেলে বনের কষ্ট জানে না।
যখন কাঁদবে মা বলে, নিও ধনা কোলে তুলে
দুখে আমার অবুঝ ছেলে মা বৈ কিছু জানে না—
অতি দুখিনির দুখে, রেখো ধনা পরম সুখে,
ক্ষুদা পেলে খেতে দিও, যেন কষ্ট পায় না।

ধনা : কোনো ভয় নেই ভাবিজী। আমি ওকে ছেলের মতো সাবধানে রাখবো। দুখের কোনো কাজ করতে হবে না। শুধু নৌকা চৌকি দেবে। দুখে মাকে ছালাম করো।

দুখে : (সালাম করিয়া) আমি আসি মা, আমায় দোয়া কর।

বিজান : যাও ধনা লয়ে তুমি দুখেরে আমার। দুখেরে সঁপিয়া দিলাম হাতেতে তোমার। যদি কোনো দোষ করে মাপ করে নিও, বনের কর্তব্য কাজ শিখায়ে দিও।

বেটার মতো রেখো ধনা দুখেরে আমার। ক্ষুদা পেলে খেতে দিও দুখিনি বাছার। বাঘ-ভাল্লুক আছে ততো রেখো সাবধানে ভাই। যদি কিছু বলো তোমার খোদার দোহাই। আয় বাপ তোকে কিছু বলে দিই। বনের মা বনবিবি বনের মাঝারে। বিপদে পড়িলে ডেকো মা বলিয়ে তারে। আঠারো ভাটার মধ্যে উনি সবাকার মা। যে ডাকে মা— মা বলে, তার দুঃখ থাকে না। খুব হুশিয়ার বাছা। থেকো সাবধানে। বনবিবি মায়ের নাম জোপো মনে মনে।

দুখে : তবে আমি আসি মা।

ধনা : ভাবিজী এখন এই দশটি টাকা নাও। তারপর মহল থেকে ফিরে এসে অনেক টাকা দেবো। আর আজ হইতে দুখে তোমার ছেলে নয়। দুখে আমার ছেলে।

(দুখেসহ প্রস্থান)

(বিবিজানের গীত)

জায় জায় গো, আমার দুখে বনে যায়,
ওগো তোমরা ধরো ধরো ওকে মানা করো।
দুখে বই আর কেহ নাই।
পেয়ে ধনার মন্ত্রণা শোনে না আমার মানা
ঘটিলো কি যন্ত্রণা আমার কপালে।

(বিবিজানের গীত)

আমি অভাগিনী এ জনম দুখিনী—
দুখে বই আর কেহ নাই, এই অভাগিনীর।
একবার ফিরে আয়।

বিজান : মা, মা— বনবিবি অভাগিনীর হৃদয় রতন তোমার কোলে দিলাম। যদি কোনো দিন বিপদে পড়ে মা, মা বলে ডাকে, তবে আমার মতো মা হয়ে তুমি তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর মা। উদ্ধার করো।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

মাঝিগণের প্রবেশ

সাধু : আরে ভাটাতো অনেক হইলো, ধনা বাই আসতেছে না ক্যান?

রহিম : আরে ঐ তো ধনা বাই অসছে।

ফেরাজ : আরে ও ধনা বাই খরো খরো আই সো। ও ধনা তোমার লোকজন কই?

(দুখেসহ ধনার প্রবেশ)

ধনা : এই তো লোক এনেছি।

আলগজ : বা, বা, বেছে বেছে বেশ লোক আনছে। এর যে আঁতুরেগন্ধ যায় নাই।

রহিম : হাঃ— হাঃ— হাঃ, আরে দুর দুর আঁতুরের গন্ধ তো দূরের কোথা, এর গলা চাপলে ঢক্ ঢক্ কইরা দুদ ওঠ বানে, ও ধনা বাই এ— কি হইবানে।

ধনা : তোমরা কি একদিন এমন ছিলে না। ও যা পারে তাই করবে। তোমাদের অত মাথা ব্যাথা কেন?

সাধু : সে বালো কথা কইছে। হারে বাচা তোর নাম কি?

দুখে : আমার নাম দুখে।

রহিম : বাঃ, বাঃ, না খাইয়া— না দাইয়া ভোরার খোপের পোচা পান খাইয়া মোরগা সঙ্গে থাকো পরম সুখে।

ফেরাজ : ও ধনা বাই তুমি কিছু পল-টল নিও কিন্তু,

ধনা : কেন পল কি হবে?

আলগজ : লায় হাগবানে, ফেলবানে কি দিয়া?

ধনা : দেখো মাঝিগণ, বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে নৌকা ছাড়ার ব্যবস্থা করো।

সাধু : লে— লে দাঁড় ধর। শক্ত কইরা ধরিস। জোর জমাটে একবার আল্লা আল্লা বল। ভাটি গাঁয়ের চাটিয়া— পাঁচপীর দরিয়া— গাজী গঙ্গা বদর-বদর।

(মাঝিগনের গীত)

নৌকা খোলো, বাদাম তোলো, ভাঁটা বয়ে গেলো
চৈত্র মাস গত হইলো— চাল চালান সব নৌকায় তোলো
ও মুখে আল্লা আল্লা বলো (২)

ধনা : দেখো মাঝিগণ, তোমাদের এই নদীর নাম এবং গ্রামের নাম বলে যেতে হবে।

মাঝিগণ : ওরে আল্লারে আল্লা, এক জ্বালায় বাঁচিনে তার উপর আর এক জ্বালা, নে—নে— ধর।

সাধু : আরে জোর জমাটে একবার আল্লা আল্লা বলো।
আঁটি গাঁয়ের চাটিয়া— পাঁচপীর দ্বরিয়া

(মাঝিগণের গীত)

শুন সবে মন দিয়ে, গাঁঙের নাম যাই বলিয়ে,
মহল করিতে যায় ধনা, হায় গো—
হাসনাবাদ বাঁয়ে যায়, রাজ-নগর ডাইনে রয়,
উপনিতো হইলো দেবহাটায়, হায় গো—
ইছামতী নদী দিয়ে বরুণ হাট ডাইনে থুয়ে
এসে পৌছলেন খাঞ্জের দয়। হায় গো—
রসুলপুর থাকে বাঁয়, বোলতলা বেয়ে যায়,
হিঙ্গলগঞ্জ উপনিতো হয়। হায় গো—
বসন্তপুর বাঁয় থুয়ে কালিন্দির গাঙ দিয়ে,
উপনিত হইলাম উসকোর দয়, হায় গো—
উসকোর ঘোলে পানি ডাকে— প্যাটের পিলে চমকে ওঠে
বাঁয়ে নবরত্ন— দেখা যায়। হায় গো—
বিক্রমাদিত্য হিন্দুরাজা, ধনে মানে মহা ত্যোজা
ঐ খানেতে বৈঠক ছিলো তার। হায় গো—
ডেমোরালি থাকে বাঁয়, সাহেব খালি বেয়ে যায়।
কলকলি উপনিত হয়, হায় গো—
কালিন্দির গাঙ দিয়ে, চাঁড়াল খালী ডাইনে থুয়ে
দুরমুস খালি ঐ তো দেখা যায়। হায় গো—
কানাই কাটি দুনে দিয়ে, পাট ঘারা ডাইনে থুয়ে,
মাধব কাটি উপনিত হয়। হায় গো—
ঘুমটিয়া নদী দিয়ে, একোঁড় বেঁকোড় বেয়ে বেয়ে
পৌঁছলেন রায়মঙ্গল। হায় গো—
ধনা বলে সাধু ভাই, আর তো গাঁঙে ভাটা নাই
সপ্তডিঙ্গা করহ চাপান, হায় গো—
সাধু বলে মধুমাঝি, শক্ত করে বাঁধ কাছি
খেয়েদেয়ে করহ শয়ন। হায় গো—
জুয়ার হইলো রায়মঙ্গল—

(সকলে প্রস্থান)

তৃ তী য় অং ক

প্রথম দৃশ্য

(রায় ও সনাতনের প্রবেশ)

দক্ষিণ রায় : দেখছো সনাতন, বসন্তকালে আমাদের এই বনোরাজ্যে কি সুন্দর মনো-মুগ্ধকর শোভা। প্রতিবনোশাখে মধুভারে করে অবনত। চতুরদিকে শান্তির সুখলহরী মুখরিত হচ্ছে। বড় শান্তিময় সনাতন বড় শান্তিময়। হ্যাঁ দেখো সনাতন, আমাদের এই শান্তি রাজ্যের মধ্যে, কেউ যেন অশান্তি সৃষ্টি করতে না পারে। তুমি সর্বদাই তার জন্য পাহারায় নিযুক্ত থাকবে।

সনাতন : প্রভু, তবে কি এই সমস্ত মোম-মধু শুধু কি আমাদের ভোগের নিমিত্ত্য।

দাক্ষিণ রায় : ভুল বুঝেছো সনাতন! শুধু যে আমাদের উপভোগের নিমিত্ত্য তা নয়, বনের মধ্যে হচ্ছে আমাদের সখের হাট। এই হাটে সওদা করবার জন্য কত সাধু বনিক ডিঙ্গা সাজায়ে আসবে। আমাদের পূজা করবে। আর এই সমস্ত মোম-মধু তারাই নিয়ে যাবে। তাই বলছি আমাদের পূজা না দিয়া, কেউ যেন এক ফোঁটা মধু না নিয়ে যেতে পারে। যদি কেউ আমাদের অজান্তে মোম-মধু নিয়ে যায়, তাহলে আমাদের কোনো প্রভাব থাকবে না।

সনাতন : তাই তো প্রভু, যেই খানে অর্থ, সেই খানে পুরস্কার। যদি আমরা কোনো দস্যু বা তস্কার ধরতে পারি?

রায় : উত্তম, ধরতে পারলে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি তাকে রীতিমতো শাস্তি দেবো। আমাদের শান্তিরাজ্যের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করবে এমন দস্যু কে আছে সনাতন। যাও তুমি এখনী ডাকিনী-যোগিনীর অনুসরণ করো।

সনাতন : প্রভু, আমি তার জন্য সদা সর্বদাই প্রস্তুত আছি। কোথায়, কোথায় ডাকিনী যোগিনীগণ?

(ডাকিনী-যোগিনীর প্রবেশ এবং গীত)

জয় জয় জয় কালি মায়কি জয়,
ধেইয়া ধেইয়া নাচে বুড়ি চমকে দেখায় ভয়।

যাও যাও সনাতন, দেরি করো না,
নরপূজা না দিলে মধু পাবে না।

(ডাকিনী-যোগিনী প্রস্থান)

রায় : সনাতন, কি যেন অশান্তির যবনিকা আমাকে আলোড়িত করে তুলছে। কেন বলতে পারো সনাতন?

সনাতন : ও কিছু নয় রায় ঠাকুর। ছত্রিশ কোটি দেব-দানব থাকতে আমরা কাউকে ভয় করিনা। এই আমি ডাকিনী-যোগিনী নিয়ে পাহারায় নিযুক্ত রহিলাম। দেখি কোন্ ব্যাটা আমাদের চোখ এড়াতে পারে।

রায় : উত্তম, এই সমস্ত রক্ষার ভার তোমার উপর রহিলো সনাতন। তুমিই রক্ষা করবে। (রায় প্রস্থান)

সনাতন : কে ঐ অদূরে বহু লোকজন নিয়ে ডিঙ্গায় সুসজ্জিত হয়ে এই কেন্দখালির দিকে অগ্রসর হচ্ছে? প্রলয় ঘটাবো, প্রলয় ঘটাবো। সাগর মেঘলা ধারায় উঠিবে গর্জিয়া— ডুবাইবো সপ্তডিঙ্গা। রুধির তপনে কোন্ বেটা আসিতেছে মৃত্যুর তরে? ধ্বংস-ধ্বংসগর্ভে করিবো বিলিন। সকল আশা করিবো নিরাশ, মদমর্ত্য করিসম ধাইলাম তবে। চাই শুধু নরমাংস। হাঃ— হাঃ— হাঃ। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মাঝিগণ, ধনা ও দুখের প্রবেশ)

গীত

গুড় গুড় ড্যাক্কা মহিরা বাদাম তুইলা
যাচ্ছি নতুন লাইয়া।
যাচ্ছি নতুন লাইয়ারে— হৈ, হৈ, হৈ
যাচ্ছি নূতান লাইয়া,
মনে সাধ কইরাছ ও ভেড়ের ছাওয়াল তুমি—
আর কি দ্যাশে যাইবা।
দ্যাশে যাইয়া— মোল্লারে হইবা হৈ-হৈ-হৈ
খাড় লাড়ার ভাত খাইবা।

সাধু : ও ধনা বাই, ক্যানে নৌকা চাপান করমু?

ধনা : সাধু ভাই আমরা কোথায় আসলাম?

সাধু : ঐ তো সামনে গড়খালী দেহা যাইতেছে।

ধনা : তবে চলো ঐ খানে চাপান করা যাক।

সাধু : এই ফেরাজ আহাশের ব্যাহার খানা দেহেছিস্?

সবাই : তাই তো আহাশের ব্যাহার খানা তো বালো লয়।

(গীত)

ইশান হোনে মেঘ কইরাছে
করতাছে সোঁ— সোঁ
হ্যাদে দ্যাখ ছিপ-ছিপানি-ম্যাঘের পানিরে।
উড়া ম্যাঘ করছে কোঁকর-কোঁ।

তৃতীয় দৃশ্য

(বনবিবি ও জংগুলির প্রবেশ)

বনবিবি : ভাই জংগুলী আমাদের এই বনরাজ্যের মধ্যে একটা শত্রু আছে। সে কিন্তু আমাদের এই ভুরকুণ্ডিয়া বনে একদিনও আসতে সাহস করে না। তুমি জানোনা ভাই। আমি এতদিন তোমাকে বলিনি। তাকে দমন না করলে আমাদের নামে কলঙ্ক হতে বসেছে।

জংগুলি : কৈ তুমি এতোদিন তো আমাকে সে কথা বলোনি ভগ্নি। সে কোথায় থাকে?

বনবিবি : সে ঐ বনের মধ্যে থাকে। তাকে ধরা খুব কঠিন। গড়খালি ও কেঁদোখালি ঐ দিকে থাকে। আমাদের এই ভুরকুণ্ডিয়া বনে একদিনও আসতে সাহস করে না। পেটের দায়ে যত সব কাঙাল গরীব বনে আসে, সে তাদের উপর অত্যাচার করে। সে মায়াবী রাক্ষস। দয়া-মায়া তার একটুও নেই।

জাংগুলী : এমন দুষ্ট-দুরাচার কে আছে ভগ্নি। আমাদের সেই আঠারো ভাঁটার মধ্যে করে অত্যাচার।

বনবিবি : শুধু অত্যাচার করে তা নয়, তার পাশবিক লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নরমাংস ভক্ষণ করে।

জাংগুলী : নরমাংস! নরমাংস ভক্ষণ করে? তবে দেখবো মায়াবী রাক্ষস। ভগ্নি, তুমি শুধু একটিবার আদেশ করো, আমি এখনি তাকে ধরে এনে রিতীমতো শাস্তি দেবো।

বনবিবি : হ্যাঁ ভাই, তাকে শাস্তি দিতেই হবে। তুমি তার অনুসন্ধান করো।

জংগুলী : তুমি আমাকে আদেশ করো ভগ্নি, আমি ভুকুণ্ডিয়া পার হয়ে তাকে এখনি ধরে আনি।

বনবিবি : যাও ভাই, তুমি যত সত্বরে পারো তাকে আমার কাছে ধরে আনবে।

জংগুলি : আমি চলিলাম ভগ্নি, দেখি কেমন সে মায়াবী। আমাদের অধিকারে করে অত্যাচার। তন্ন তন্ন করে খুঁজিবো পর্বত কন্দর। নাহি পাবে পরিত্রাণ, আজ জংগুলী রুধিলে নাহি পাবে পালাইবার স্থান। জংগুলী সলিলে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ি বাহির হইবে প্রাণ— জংগুলী জ্বলিলো আজ পর্বতসমান। পবনের গতি সমো ধাইলাম তবে। পাশবি কানন মাঝে শুধু মার— মার রবে। (দ্রুত প্রস্থান)

বনবিবি : ব্রহ্মাংশে লভিয়া জন্ম রাক্ষস বৃত্তি করেছো অবলম্বন। এইবার দেখা যাবে কেমন মায়াবী রাক্ষস। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(রায় ও সনাতনের প্রবেশ)

রায় : সাবধান, সনাতন, খুব সাবধান, এই বেটা এসেছে— এরই নাম ধনাই মৌহলে। বাড়ি হচ্ছে বরিজহাটী, বেটা খুব আড়ম্বর করে এসেছে। খুব সাবধান সনাতন, একফোটা মধু যেন না পায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে নরপূজা না দিচ্ছে। ততক্ষণ পর্যন্ত বেটাকে এক বিন্দু মধু না দেওয়া হয়।

ধনা : মা, মা বনবিবি— মাগো। (নেপথ্যে)

রায : শুনছো, শুনছো সনাতন— ব্যাটার মুখে শুধু মা— মা— মা বুলি। দেখবো তোর মা কোথা থেকে মধু দেয়। যতক্ষণ আমার নাম উচ্চারণ না করবি, ততক্ষণ তোকে একবিন্দু মধু দেব না। সনাতন এখনও অপেক্ষা করছো? যাও সমস্ত অরণ্যের মধু হরণ করে এসো। (প্রস্থান)

সনাতন : বহু পূর্বে করিয়াছি প্রতিকার, মোম-মধু যত বল করেছি হরণ। নরমাংস বিনা কভু না পাইবে মধু। আনন্দে নাচিবে প্রেত-ভূচর-খেচর খিল্‌খিল্‌ রবে অট্টহাসি। ধেই ধেই নাচিবে নরপিশাচ— খাইবে নরমাংস। ছড়াইবে রুধির অন্ধকারে, গ্রাসিবো ধারা। টলমল টলিবে মেদিনী, চাই শুধু নরমাংস। চাই শুধু নরমাংস। হাঃ— হাঃ—হাঃ

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(মধু ভাঙতে সাধু বাদে মাঝিদের প্রবেশ)

রহিম : আরে এ সাধু বাই— সাধু বাইরে, আমার সাতশ বাহে তাড়া করছে। (চিত হয়ে শুয়ে কাঁপতে থাকে)

(আলগজ ও ফেরাজ ছুটিয়া আসে এবং রহিমকে ধরে তোলে। রহিম কাঁপতে থাকে)

ফেরাজ ও আলগজ : এ রহিম বাই তোর কি হইচে কতো দেহি।

রহিম : (কাঁপতে কাঁপতে বলে)— বা-ঘ, বাঘ!

আলগজ ও ফেরাজ : (ভয়ে ভয়ে) বাঘ— কনে? এ রহিম বাঘ কনে? (রহিমকে ধরে কাঁপতে কাঁপতে চারি দিকে দ্যাখে)

রহিম : ঐ ওহানে— ওহানে!

(ছুটিয়া সাধু ভাইয়ের প্রবেশ)

সাধু : এ রহিম, তোদের হইচে কি?

সবাই : ঐ ওহানে, সাধু বাইরে— ঐ ওহানে।

সাধু : এই আলারা ওহানে কি?

সবাই : ঐ ওহানে,

সাধু : যতসব বন-কচুর দল, হালায় দিমু— মোকে আসতে দে।

রহিম : সাধু বাই খবর্দার ব্যাশকম কথা কইবিনি।

সাধু : আরে তোদের কি আইলো কত দেহি।

(সাধু বাদে সবাই বাঘের ভয়ে ভীত হয়, সবাই চারিদিকে ঘোরে বাঘ-বাঘ করতে করতে)

আলগজ : রহিমকে সাতশ বাহে তাড়া করেছে।

সাধু : আপনারা শুনেছেন এদের নাকি সাতশ বাহে তাড়া করেছে।

রহিম : আরে তা না হয় দুশত তো আইবে।

সাধু : আরে দু'শত বাঘ এই বনে আছে? কতো দেহি।

ফেরাজ : আরে তা না হয়— একশ তো হইবে।

সাধু : কি জ্বালায় না পড়েছি আমি। এই গন্ডমুক্ক নিয়ে বাদায় আয়ছি।

আলগজঃ আরে দু-কুড়ি দশটা তো হইবে।

সাধু : এই— এই শোন বাঘ দেহেছিস?

রহিম : না দেহিনি।

সাধু : কহ তো দেহি বাঘ কেমন?

ফেরাজঃ কেনো? লেজ নাড়ে, ঘাস খায়, আর ভোঁতর ভোঁতর করে।

সাধু : শুনেছেন, বাঘ নাকি লেজ নাড়ে, ঘাস খায়। আর ভোঁতর ভোঁতর করে।

রহিমঃ তবে ওহানে লড়সে কি?

সাধু : তাই কতে হয়, তাই কতে হয়— যে ওহানে লড়ছে কি? আসার সময় ঐ হানে একটা গোলের ঝাড় ছিলো না। বাতাসে সেই গোলের ঝাড় হর-বর করছিলো।

রহিম : না একথা আমার মনে খাটলো না। ঠিক এট্টা খাইছে।

ফেরাজ : এ রহিম আয় আমরা লোক মিল করে দেহি।

আলগজ : সে বালো কথা হইছে। আমরা লোক মিল কইরা দেহি। এ রহিম তুহ গুনে দ্যাখ।

রহিম : এই এট্টা, এই দুটা, এই তিনটা, আর এট্টা বাহের...

(ক্রন্দন)

সাধু : এই রহিম তুই এট্টা, তুই গুনছি আর মোকে বাদ দিচ্ছিস?

ফেরাজ : ও সাধু বাইরে, যে গোনে— তাকে বাদ দিতে হয়রে সাধু বাই।

সাধু : কি জালায় পড়ছি আমি, এইসব নিয়ে বাদায় আয়ছি। এই তোরা এক কাজ কর। গাছের পাতা হাতে নিয়ে মিল কর। গাছ থেকে সবাই এট্টা করে পাতা এহানে রাখ। এ রহিম বালো কইরা গুনে দ্যাখ।

রহিম : এই এট্টা, এই দুট্টা, এই তিনটা, এই চারটা ঠিক হয়েছে। সাধু বাইরে, গোনা গরু কি বাহে মারতে পারেরে সাধু বাই।

(গীতকণ্ঠে ভক্তমালার প্রবেশ)

(গীত)

ভাইরে এসব এক গোয়ালের গরু
এক খোয়াড়ে পড়লে ধরা সরু আর বরু
এক দরে যায় মিছরি মুড়ি— নুর বেগম আর
পচাখালে মরলে ডুবে বাদসা জাদার
এপিট ওপিট যতই দেখি দুনিয়াদারী সবই মেকি
সব শেয়ালের একই বুলি মোটা কিম্বা সরু।

(প্রস্থান)

সাধু : নে— নে— নে ছাটা ধর (ছাটায় চার জন পাঁচদিকে যায়)।

সবাই : পোয়া যায়— পোয়া যায় (বলতে বলতে প্রস্থান)

পুনরায় সবাই : পোয়া যায়, পোয়া যায়।

(বলতে বলতে প্রবেশ এবং ঐ বলতে বলতে প্রস্থান)

পুনরায় : পোয় যায়— পোয়া যায় (বলতে বলতে সাধু ও রহিমের প্রবেশ)।

(ফেরাজ ও আলগজ বেছাটায় চলে যায়)

রহিম : এই ফেরাজ এই আলগজ (বাইরে) (উঃ ফেরাজ উত্তর দেয়) এই ফেরাজ। আলগজ বাই কনে?

ফেরাজ : এই আলগজ বাই, আলগজ বাইরে?

(বাহিরে থেকে উত্তর দিতে দিতে আলগজ আসে, পোয়া যায় পোয়া যায় বলতে বলতে)

রহিম : যাস কনে এ্যাঁ, কইছিনা এ বড় ডাক মেরে জায়গা। যেন বেছাটা যাসনে, দেখছিস না চারদিকে মধুর হাট বসেছে।

(সবাই মধুর চাক দেখতে থাকে)

সাধু : এই রহিম লে-লে ধোঁয়া দে। (সবাই মধুর চাকে ধোঁয়া দিলো। মধু পাইলো না, ভাবিতে লাগিলো।)

রহিম : এ সাধু বাই এত বড় বড় চাক, এতে এক ফোঁটা মধু নেই।

সাধু : তাই তো রহিম এ বড় তাজ্জব ব্যাওয়ার। ধনা বাইকে ডাকতো।

আলগজঃ আরে ও ধনা বাই। ধনা বাই খরখর আইসো খরখর আইসো।

(ধনার প্রবেশ)

ধনা : সাধু ভাই কতটা মধু হয়েছে?

রহিম : আর কতটা— এক ফোটাও না।

ফেরাজ : নাস্তা খাওয়ার মত এক ফোটাও না।

ধনা: কি করা যায় বলোতো সাধু ভাই?

সাধু : তুমি যখন কইছো, এট্টা মদ তোমাকে দিমু। এই তোরা সব এই দিহে সইরা দারা। ধনা বাই এহানে না খাইয়া না দাইয়া শুইয়া রইলে খোয়াবে কিছু অইতে পারে।

রহিম : তা এহানে না খাইয়া সোজা বাহের প্যাটে গিয়া বইলে বাল হইতো।

সাধু : তোদের রইতে হবে না। তোরা তো কেবল খাইতে আইছিস্। যত সব বন-কচুর দল। এই দুহেকে একটু পানি নিয়ে ডাকতো।

ফেরাজঃ এ দুয়ে— দুইয়ে— দুইয়ে একটু পানী লিয়ে আয়। আমার একুন গোছল করা হইনি।

(জল লইয়া দুখের প্রবেশ)

রহিম : এই আগে মোকে দে। (সবাই হাত মুখ ধোয়)

সাধু : এ রহিম, না-মাজ তো করবি। পশ্চিম দিক কোনটা— ক'তো দেহি। (মাঝিরা সবদিক ঘুরে বলবে)

রহিম : এই— এইটা পশ্চিম দিক। (পূর্ব দিক দেখাইলো)

আলগজ : এই— এইটা নির্ঘাত অইবে। (উত্তর দিক দেখাইলো)

সাধু : তোরা তো বেশ পশ্চিম দিক দেহাই ছিস।

সকলে : কেনো মোদের অইলো না? আচ্ছা তুই দেহা তো।

সাধু : আমি দেহাবো, আচ্ছা বড় তারাটা কহানে দেহাতো। (সবাই বড় তারা খুঁজতে থাকে এবং বড় তারা দেখে)

সকলে : এইটা পশ্চিম দিক।

রহিম : আগে আমি দেহায়ছি।

ধনা : হায় খোদা এতো টাকা কড়ি ভেঙে, এতো লোক জন নিয়ে এক ফোটা মধু পেলাম না, কেন আমি ভাইয়ের কথা শুনিনি। খোদা আমাকে কিছু মোম মধু দাও। (শয়ন)

(রায় প্রবেশ করিয়া দুখেকে খুজিয়া তার উপর দৃষ্টি দিয়া প্রস্থান)

রায় : (নেপথ্যে) কেন ওরে ধনা মাঝি শুয়ে অনাহারে। কি দুঃখ পেয়েছো বাছা কহ বিস্তারিয়ে। দেখিয়া তোমার দুঃখ ফেঁটে যায় হিয়া। সদ উপায় করবো আমি বিপদ নাশিয়া।

ধনা : কে— কে এই বিজন বনের মধ্যে নাম ধরে ডাকলে মোরে। নিস্তব্ধ নিথর হেরি সমস্ত কান্তার। চারি দিকে শুনি শুধু বন্যপশুর চিৎকার। এরই মধ্যে কে নাম ধরে ডাকলো। স্বর শুনে হয় অনুমান নারীকণ্ঠে কহিলা আমায়। কৈ কৈ মা নিজ গুনে কৃপা যদি করিলে দাসেরে। ছলনা ত্যেজিয়ে মাগো, দেখা দাও, দেখা দাও মোরে। এস এস মাগো।

রায় : (নেপথ্যে) আরে হতভাগ্য মা বলিস কারে। জানিস আমি কে?

ধনা : কে? প্রভু, অপরাধ যদি কিছু করে থাকি তায়, ক্রোধ সম্বরিয়া প্রভু হও হে সদয়।

(রায়ের প্রবেশ)

রায় : এই দেখ ধনা, এই আমি এসেছি। কেন এসেছি জানিস, তোর দুঃখ দূর করবার জন্য। তুই আমাকে চিনিস না। দণ্ডবক্ষ মুনি ছিলো ভাটার প্রধান, দক্ষিণ রায় নাম মোর তারই সন্তান, বনে যত মোম-মধু সব আমার সৃষ্টি। যে জন করে পূজা, তারে দেই দৃষ্টি।

ধনা : সত্যই যদি ভাটার ঈশ্বর হয়ে থাকো তুমি, তবে কেনো মোম-মধু নাহি পাই আমি। অপরাধ যদি কিছু করে থাকি— ক্রোধ সম্বরিয়া প্রভু হও হে সদয়।

রায় : শোন ধনা, বহুদিন হইলো কেহ নরপূজা দেয় নাই। তুই যদি পারিস নরপূজা দিতে সপ্ততরী মোম-মধু আমি তোকে পারি দিতে।

ধনা : কি বল্লেন (২) রায় ঠাকুর নরপূজা?

রায় : হ্যাঁ নরপূজা। আমাকে একটা নর দিতে হবে। তাহলে তোর মোম-মধুর অভাব হবে না। অষ্টমবর্ষীয় শিশু, নাম যার দুখে। তাকে দিয়ে মোম-মধু নিয়ে যাও সুখে।

ধনা : উঃ রায় ঠাকুর, একে নরপূজা শুনে প্রাণটা আমার আতঙ্কে শিহরে উঠেছে! তার উপর দুখে— তাকে দিয়ে মোম-মধু নিয়ে যাও সুখে। না— না রায় ঠাকুর। আমি মোম-মধু চাইনে। আমায় রক্ষা করো প্রভু। আমি দেশে ফিরে যাই।

রায় : শোন (২), ধনা শোনরে তবে। লোকজন ডিঙ্গাসুদ্ধ খাওয়াইবো কুম্ভিরে। দেখি বেটা দেশে ফিরে যাও কেমন করে।

ধনা : সেও ভালো, তবু আমি দুখেকে দিতে পারবো না।

রায় : কি দুখেকে দিতে পারবি না?

ধনা : না— না— রায় ঠাকুর, দুখেকে আমি কখনই দিতে পারবো না।

রায় : কি আমার সঙ্গে বাদ করে দেশে যাবি ফিরে? যাইতে দিব না ধনা। ডুবাইবো তোরে, ডুবাইবো সপ্ততরী, লোকজন সব কুম্ভিরে খাওয়াবো। ধনে-প্রাণে ধনা তোরে মজাইয়া দিবো। ছত্রিশ কোটি দেব-দানব যারা আছে। কেহ নাহি রক্ষা পাবে রাক্ষসের কাছে। সাঁতার দিয়ে যদি কেহ ডাঙার উঠিবে। হুকুম দিলে তারে তখন বাঘে ধরে খাবে।

ধনা : উঃ একি অবিচার খোদা, এই কঠিন সমস্যার মিমাংসা তুমি করে দাও। কেমন করে একথা আমি উচ্চারণ করবো। কেমন করে বলবো যে দুখে তোকে আমি বনে কর দেবো। হায় হায় দুখে তোর কপালে কি এই ছিলো!

কেনো তোকে না না কথা বলে ভুলিয়ে এনেছিলাম বনে। উপায় নেই কোনো উপায় নেই। দুখে— দুখে— না— না ডাকবো না। একবার যদি চাচা-চাচা বলে ডাকে তাহলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। সব পণ্ড হয়ে যাবে। রায় ঠাকুর তব সনে করি নিবেদন, দুটি ভাই আছি মোরা লহ একজন। দুখিনীর দুখে ছাড়া আর কেহ নাই। দুখেকে চেয়না ঠাকুর ধরি তব পায়।

রায় : ধনা, কেন বার বার কর অনুরোধ। দুখেরে দিতেই হবে। পূর্বের ভানু যদি পশ্চিমে প্রকাশে, অমাবশ্যার নিশিতে যদি চন্দ্রিমা আকাশে, ভেকগন ফনিশিরে যদি নিদ্রা যায়। কোকিলের কণ্ঠে যদি বায়সেতে পায়। পিপিলিকার পায় যদি ক্ষিতি টলমল তথাপি প্রতিজ্ঞা আমার অচল অটল।

(গীতকণ্ঠে ভক্তমালার প্রবেশ)

খবর্দার খবর্দার খবর্দার—
ঐ চেয়ে দেখ হাঁকরে আছে সামনে নরকদ্বার।

রায় : কে— কে তুই?

(গীত)

আমি রতনের খনি গিরি হিমালয়,
সাহারার মরু আমি জ্বালাময়।
আমার ইঙ্গিতে রয়েছে ঘিরিয়া মঙ্গল সবাকার।

(প্রস্থান)

ধনা : যেওনা যেওনা ভাই বিপদ কালে আমাকে অভয় দাও। আমাকে রক্ষা করো।

রায় : ধনা কিছু বলছো না যে?

ধনা : উঃ কি নিষ্ঠুর, এ অরণ্যে রোদন করে আমার কোনো ফল হবে না। যদি

সহজে দিতে হয় তাও দিতে হবে। যদি জোরে দিতে হয় তাও দিতে হবে। কিন্তু জগতের লোক চিরদিন বলবে ধনা বিশ্বাস ঘাতক, এ কলঙ্ক আমার চিরদিন অক্ষয় কবচ হয়ে থাকবে। রায় ঠাকুর— আমি দুখেকে দিতে স্বীকৃত কিন্তু জগতের লোক যেন কেউ জানতে না পারে।

ধনা এইবার তোর মনস্কামনা পূর্ণ হলো। সকালে উঠে কেন্দোখালী যাস। সেইখানে আমি মধুর হাট বসিয়ে রেখেছি। তুই যত পারিস মোম-মধু নিয়ে যাস। কিন্তু খুব সাবধান— খুব হুঁশিয়ার, যাওয়ার সময় যেন দুখেকে কেন্দোখালী পাই। (প্রস্থান)

ধনা : হায় বিধি সত্যই তুমি কি নির্দয়া হলে। আমি ধনে-প্রাণে যাই তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু দুখিনীর দুখের উপর কেন বাদ সাধলে— হায় খোদা আমার এ পাপের পরিণাম কি ইহ জগতে আছে। তাইতো বড় ঘুম পাচ্ছে। হায় খোদা, আমার এই ঘুম যেন কালঘুমে পরিণত হয়। (শয়ন)

দুখে : শুনি মোরে ধনা চাচা রায়ে যাবে দিয়ে। চাচা যাবে দেশে চলে, মোম-মধু নিয়ে। দেশেতে গিয়ে চাচা ধনবান হবে। মা দুখিনী অনাথিনী ভিক্ষা মেঙে খাবে। কোথায় আছো বনবিবি দেখা দাও মা। বিপদের কালে মাগো দেখা পাব না? আসিবার কালে মাতা বলেছিলো মোরে। বিপদে পড়িলে ডেক মা বলিয়ে তারে। কৈ, মা, এসো মা, দেখা দাও মা। শুনিয়াছি মায়ের মুখে তুমি মাতা বিপদতারিণী। দেখা দাও মা। যেন তোমার অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক না হয় মা। এসো মা এই হত ভাগ্যের এত ক্রন্দনে তোমার আসন কি টলবে না মা?

(দুখের গীত)

মা-মা-মা-তোকে ডাকবো কত
পাষাণ হৃদয় কি তোর গলে না—
না হয় যদি মা-মা বুলি
ডাকবো তোকে কি বোল বলে।
এযে মায়ের দেওয়া মা-মা বুলি।
আমি আর তো কিছু জানিনা।

(গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশে বনবিবির প্রবেশ)

(গীত)

দেখরে দুখে নজর করে আমি যে তোর মা
খুদকুড়ো অঞ্চলে বাঁধা আমায় চেনো না,
বনে যখন এলে তুমি বারণ করে ছিলাম আমি।
না শুনিলে মায়ের বানি, পেয়ে ধনার মন্ত্রণা।

বনবিবি :

কেনো বাছা ডাকিয়াছো ওরে যাদুধন,
আসিবার কালে তোকে করিনু বারণ।
না শুনিলে মায়ের বাণী পেয়ে ধনার মন্ত্রণা,
ধনার হাতে পড়ে এখন ঘটিলো কি যন্ত্রণা।
সময়ের বন্ধু বাছা সকলেই হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহো কারো নয়।

দুখে : কে? কে তুমি অনিন্দ সুন্দরী রূপময়ী কমলা রূপিনী। শুনিয়া সন্তানের করুণ রোদন, মাতৃরূপে এলে দিতে দরশন। কে তুমি মা? অধমকে সত্যপরিচয় দাও মা।

বনবিবি : বনে এসে বনবিবি বলে সকলে। কি বিপদে পড়েছো বাছা কহ বিস্তারিয়া।

(ছদ্মবেশ খুলিলো)

দুখে : কে? তুমি মা বনবিবি। ধরিতব পায়। ঠেলিয়া ফেওনা মাগো রেখো রাঙা পায়। যে বিপদে পড়ে মাগো ডাকিনু তোমায়। তাহার চিন্তা এবে কহি তব ঠাঁই। বিয়ে দেবে বলে চাচা এনেছিলো বনে। অঙ্গীকার করেছেন তিনি রায় মনির সনে। আমাকে দিয়ে, মোম-মধু নিয়ে চাঁচা যাবে দেশে। দুখিনী মায়ের দশা কি হইবে শেষে। এই কথা শুনে মাগো আমার প্রাণে বড় ভয়। মায়—মা বলে সদাই আমি তোমায় ডাকি তাই।

বনবিবি : পা ছাড়ো— পা ছাড়ো দুখে, এসো আমার কোলে, আজ হতে দুখিনীর ধন তুমি আমার ছেলে।

দুখে : আঃ কি শীতল অঙ্গ। আমার সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেলো মায়ের পরশ পেয়ে। আমাকে রক্ষা করবেন তো মা। রাত্রি শেষ হইলে আমার জীবনলীলা শেষ হবে। সেই দক্ষিণ রায়ের গর্জ্জন এখনোও আমার বুকে জাগছে। আমাকে রক্ষা করবেন তো— মা।

বনবিবি : আমি যখন তোমাকে অভয় দিয়েছি, তখন তোমার কোনো ভয় নেই।

(জংগুলীর প্রবেশ)

জংগুলী : না— না— না। তন্ন তন্ন করে সমস্ত গিরিগুহা খুঁজলাম। কিন্তু সেই মায়াবী রাক্ষসের ধরতে পারলাম না। একি ভগ্নি তুমি এখানে? এই বা কে? কি ব্যাপার ভগ্নি?

বনবিবি : ধনা মৌহলে এই অনাথ বালক দুখেকে নিয়ে মহল করতে এসেছিলো, কিন্তু দক্ষিণ রায় দুখেকে কর নেবে। তাই দুখে, মা— মা বলে কাঁদছিলো। সেই জন্য আমি ওকে অভয় দিতে এলাম।

জংগুলী : উঃ এই টুকু দুগ্ধপোষ্য বালকের উপর তার একটু করুণা হল না ভগ্নি?

তুমি একটি বার আমাকে দেখিয়ে দাও। আমি তার সঙ্গে একটু আলিঙ্গন করবো, বাহুর বাঁধনে বক্ষে চেপে ধরে। দুখে, সকালে যদি ধনাই মৌহলে কেঁদোখালী যায়, তার দর্পচূর্ণ করবোই করবো।

বনবিবি : সে যেন দুখেকে কোনো আঘাত করতে না পারে।

জংগুলী : আমি দুখের রক্ষার জন্য ছায়ার মতো তার পিছু পিছু ঘুরবো। দেখি সে কি করতে পারে।

দুখে : না মা, আমি তার সামনে যাবো না। আমি যদি তার সামনে যাই, সে আমাকে খেয়ে ফেলবে,

বনবিবি : দক্ষিণ রায় তোমার একটা কেশ স্পর্শ করতে পারবে না দুখে।

জংগুলী : ভগ্নি নৌকায় সকলে জাগরিত হলে এখনি সব প্রকাশ হয়ে যাবে। চলো আমরা সত্বরে এখান থেকে চলে যাই।

বনবিবি : বাপ দুখে, তুমি যখন বিপদে পড়বে আমার নাম স্মরণ করলে, আমি তখনই তোমার বিপদ থেকে উদ্ধার করবো। এসো ভাই জংগুলী। (উভয়ে প্রস্থান)

দুখে : বিশ্বাস হইলো আমার পাষাণ হৃদয়ে সত্যই রক্ষিবেন মাতা বিপদ সাগরে। এইবার শয়ন করি। (শয়ন)

ধনা : রজনী প্রভাত হল, হয় অনুমান— পূর্বদিকে দিবাকর হইলো উদয়। আর তো নাহিকো নিশি। সাধু ভাই ওঠো রাত্র প্রভাত হয়ে গেছে।

সাধু : আল্লা— আল্লা এই রহিম, এই ফেরাজ, তোরা সব ওইঠা পড়। রাত্রি ফজর হয়ে গেছে।

ফেরাজ : আল্লারে এট্টু ঘুমাবার জো নাই। এ রহিম, এ আলগজ ওঠ্ ওঠ্।

রহিম : লায় লাহ ইল্লা এলায়েতে ওলায় যায় এট্টা বাদে দুইটা খায়।

সকলে : এ রহিম কি কইছিস কি?

রহিম : আমি যেন কি রকম খোয়াব দেখছিলাম।

ধনা : দেখো সাধু ভাই, এখান থেকে নৌকা ছেড়ে কেন্দোখালি যেতে হবে।

আলগজ : কেন, এ খালী মধু অইবে না?

রহিম : এ সাধু বাই, ও কি করে জানলো যে এ খালি মধু অইবে না?

সাধু : ও ধনা বাই, তুমি কি করে জানলে যে এহানে মধু অইবে না?

ধনা : শোনো সাধু ভাই, এক বীরপুরুষ এসে বলে গেলো যে কেন্দোখালী গেলে মধু মিলবে।

রহিম : কর-ফর চাইনি তো? বুজো কিন্তু ওটা বারী ডাকমেরে যায়গা।

ধনা : শুনো মাঝি ভাই, আমি তোমাদের কাছে কিছু গোপন রাখবো না। সেই বীরপুরুষ তার নাম দক্ষিণ রায়, সে চায় একটা কর।

সকলে : ওরে আল্লারে একে বারে গেছি। ওরে মোরগো বিবি যে মধু দিয়া পান্তা খাবার কথা কইছিলো। (ক্রন্দন)

ধনা : শোনো মাঝিগন, তোমাদের কোনো ভয় নাই। সে দুখেরে চায়, তোমরা চেচা-মেচী কোরো না। দুখে জাগবে।

ফেরাজ : না হইলো না, এত বড় বড় ড্যাকরা থাকতে ওইটুকু ছাওয়াল সেকি চায়। না— না— যাওয়া অইবে না।

সাধু : এই আলার পো ব্যাটা আলারা। মোরগা এত লোক থাকতে ভয়কি। না হয় ওদের দুই বাপ্পুই কে হাত পা বেঁধে তুলে দেবানে।

ফেরাজ : বালো যুক্তি অইচে। ও ধনা বাই তাহলে এবার দুখেকে ডাহা যাক।

ধনা : হ্যাঁ, দুখেকে ডাকো।

রহিম : এই দুহে উঠ উঠ, কেন্দোখালী যেতে হবে।

দুখে : না না— মাঝিগণ তোমরা কেন্দোখালী যেও না।

রহিম : তোর কথা মত কাজ করতে হবে নাকি। এই ফেরাজ ছি খুলে দে।

দুখে : সেই কেন্দোখালি যেখানে আমার জীবনদ্বীপ নিভে যাবে। সেই কেন্দোখালী।

(গীত)

আমি চলিলাম কেন্দোখালী—
নিষ্ঠুর হলো চাচা আমার। কাল হল রায়মনি।
শুনিলে মা আমার কথা পাষাণে ভাঙিবে মাথা
আমি ছাড়া কেহ নাই আর— মায়ে জনম দুখিনী।

(গীতশেষে সকলে প্রস্থান)

চ তু র্থ অ ং ক

প্রথম দৃশ্য

(বনবিবি ও জংগুলীর প্রবেশ)

জংগুলী : ভগ্নি এই সেই কেন্দোখালী, এখানে আসবে ধনা মৌহলে?

বনবিবি : ভাই জংগুলী বনমধ্যে থাকো লুকাইয়া, সে যেন জানতে না পারে।

জংগুলী : ভগ্নি একবার তাকে দেখা পেলেই হয়। দেখব কেমন সেই বীর দক্ষিণ রায়।

বনবিবি : চলো ভাই আর দেরি না করাই ভালো। এখনই হয়তো ধনাই মৌহলে এসে পড়বে।

জংগুলী : চলো আমরা বায়ুর উপর ভর করে ধনায়ের সঙ্গে থাকি। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ধনা, দুখে ও মাঝিগণের প্রবেশ)

সাধু : ধনা বাই এইতো কেন্দোখালী আসলাম।

ধনা : সাধু ভাই আজ সকলে মালে উঠতে হবে।

ফেরাজ : আর এদিহে?

আলগাজ : বাত রাঁধবে কে?

ধনা : আজ ভাত রান্না করবে দুখে।

রহিম : দুহে বাত রাঁধবে আর তোরা এসে গপাস গপাস করে খাসকানে।

দুখে : চাচা আমি এত লোকের ভাত রাঁধতে পারবো?

রহিম : না— তা পারবি ক্যান। তুই তোর চাচার আর তোর পিণ্ডি পাকাসকোন্। আর মোরা খাবানে ডোরা খোপের পোচা পানী।

দুখে : আমি তো ভাত বাঁধতে জানিনে।

ফেরাজ : জালে না, শ্যাখ।

দুখে : আমি তা পারবো না।

আলগজ : তবে এক কাজ কর, তোর চাচা আর তুই মহলে সর। আর আমরা তোরগা পিন্ডি চটকাই।

ধনা : বাজে কথায় সময় নষ্ট করোনা। সকলে মালে ওঠো। দুখে তুমি ভাত রান্না করে রেখো। দেখতে পাচ্ছ না— দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। (প্রস্থান)

সাধু : দেখ বাবা দুহে, আমার জন্য বড় ভাঙাল মাছের মাথাটা রাখিস বুঝলি?

ফেরাজ : এ দুহে আমার জন্য গোল্লা চিংড়ীর মাথাটা বাতে দিস্।

আলগজ : এ দুহে আমার জন্য একটা বড় রহুন বাতে দিস্।

রহিম : এই দুহে বাত চাই। আর বড় মাছের মাথাটা চাই। তা নাহলে তোরে খাইয়া ফেলবানে। (সকলে প্রস্থান)

দুখে : আমি কি করে এই চৌদ্দগণ্ডা লোকের ভাত রান্না করি। যদি আমি ভাত রান্না করে না রাখি, তাহলে হয়তো মহল থেকে ফিরে এসে আমাকে মেরে ফেলবে। না হয় বাঘের মুখে ফেলে দেবে। আচ্ছা, মা-তো বলে গেছে বিপদে পড়লে ডাকতে। আগে একবার চেষ্টা করে দেখি। (রান্নার চেষ্টা করিলো) কই এ যে হয়না। কাঁচা কাষ্ট, ছাঁদাহাঁড়ী কি করে হবে। কোথায় আছো বিপদতারিণী মা বনবিবি। দেখো তোমার দুখে কি বিপদে পড়েছে।

(গীত)

কোথায় মা বনবিবি
একবার দেখা দাও আমারে,
বিপদে পড়িয়ে মাগো ডাকি যে তোমাকে।
আমি অনাথ দুখি বলে থেকোনা-মা আমায় ভুলে।
ঐ চরণে স্মরণ নিলাম রক্ষা করো দয়া করে।

(দ্রুত বনবিবির প্রবেশ)

বনবিবি : এই দেখ দুখে এই আমি এসেছি। কি জন্য ডেকেছো বাপ দুখে?

(দুখের গীত)

কাঁচা কাষ্ট নাহি জ্বলে
ছাঁদাহাঁড়ি মা এমনি গলে।

দুখে : কি জানি মা, আমি মনে করেছিলাম গড়খালী থেকে কেন্দোখালী অনেক দূরে এসে পড়েছি। এখান থেকে ডাকলে হয়তো তুমি শুনতে পাবে না। তাই আমার মনে বড় ভয় হচ্ছে।

বনবিবি : এতো বেশিদূর নয় বাবা। এই আঠারো ভাটার মধ্যে যে আমার নাম ধরে ভক্তি করে ডাকবে তার ডাকে আমার আসন টলবে এবং আমি তখনি তাকে

বিপদ হতে উদ্ধার করবো।

দুখে : মা ধনা চাচা বলে গেছেন খানা পাকাইতে। পাকাইতে না জানি খানা, না পারি রাঁধিতে। কাঁচা কাষ্ঠ নাহি জ্বলে ধরে না আগুন। ফুঁকিতে ফুঁকিতে মাগো ওষ্ঠাগত প্রাণ। মা— ধনা চাচা বলে গেছেন খানা পাকাইতে। যদি মহল থেকে ফিরে এসে দেখে যে, আমি ভাত রান্না করিনি, তখন ওরা হয়তো আমাকে মেরে ফেলবে। না হয় বাঘের মুখে ফেলে দেবে, আমার উপায় কি হবে মা?

বনবিবি : তার জন্য চিন্তা কি বাপ দুখে, তুমি সরে বোস। ধনার ভাত আজ আমি রান্না করবো।

(বনবিবির গীত)

১

সরে বসো তুমি, অন্ন রাঁধি আমি
মহলেতে ধনা আসিবার লাগি।
আমার হাতের খানা, ধনা লয়ে খাবে,
চৌদ্দপুরুষ ধনার উদ্ধার হয়ে যাবে।

২

এই ছিলো কি বিধির মনে
হাঁড়িতে হাত দিতে হল। (২)
দুখের ক্রন্দন শুনে ধনার ভাত আজ রাঁধতে হলো।
আর কেন্দো না যাদুমণি, ঐ দেখ ভাত রান্না হলো।

দুখে : মা, এই তো ভাত রান্না হলো, কিন্তু চৌদ্দগন্ডা লোক আর এই এক মুষ্টী ভাত কি করে কুলাবে মা?

বনবিবি : আমি বলি এতেই হবে, বিছমিল্লা বলে ভাত সবাকারে দিও। আজিকার সকোলে খেয়েও আরো পান্তা খাবে। এখন আমি আসি দুখে, ধনা আবার শীঘ্র নৌকায় ফিরবে। (প্রস্থান)

দুখে : মা, এই হতভাগ্যের কথা যেন ভুলে যেওনা। দয়াময়ী মা আমার দয়ার অবতার। যে জন যে ভাবে ডাকে উনি সবাকার। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(সবাই মধু ভাঙিতে ভাঙিতে মাঝিগণের প্রবেশ)

সাধু : আরে পোয়া যায়— পোয়া যায়, আরে দ্যাখ দ্যাখ মধুর হাট বসেছে।

ফেরাজ : এ রহিম ধোঁয়া দে, ধোঁয়া দে। রহিম ধোঁয়া দিতে দিতে সাধুর দাড়িতে ধরিলো

সাধু : ওরে আল্লারে আল্লা একেবারে গেছি।

রহিম : এ সাধু বাই আমি মনে করেছিলাম সাদা দেহাতেছে ঐ বুঝি?

সাধু : আরে আলার পো ব্যাটা আলারা ঐ দেখতে পাচ্ছিস। ধোঁয়া দে, ধোঁয়া দে, নে— নে— কাট।

ফেরাজ : হায় হায় করচিস কি রহিম? সাধু বাইয়ের দাড়িটা একেবারে ফাঁকা করচিস? (দাড়িতে হাত বুলায়)

সাধু : হালায় দিমু আলারা ধোঁয়া দে— ধোঁয়া দে। (সবাই ধোঁয়া দিয়া মধু কাটিতে লাগিলো।

ধনা (নেপথ্যে): সাধু ভাই, তোমরা করছো কি? নৌকা যে মারা যায়।

(নেপথ্যে রায়ের বাণী)

দেখ ধনা, মধু ফেলে দিয়ে মোম বোঝাই করে নিয়ে যা। মধুর চেয়ে মোমের দাম অনেক।

ধনা : (নেপথ্যে) সাধু ভাই নৌকা মারা যায়।

সাধু : এই চল চল, লায় চল।

রহিম : এ সাধু বাই লে— লে মধুর আঁড়ীলে।

ফেরাজ : এ সাধু বাই পারবিনি তো?

আলগজ : এ সাধু বাই আমি নিই?

রহিম : রাখ— রাখ আলগজ বাই। সাধুবার ঘাড়টা দেখেনি। (ঘাড় দেখিলো) এই আলগজ বাই, সাধু বার ঘাড় পুরু আছে। লে— লে সাধু বাই আঁড়ীলে আঁড়িলে।

(সবাই ধরে আঁড়ী সাধুর মাথায় তুলে দিলো)

সাধু : চল— চল তোরা, ছেলে মানুষ তোরা সব আগে চল।

(সবাই আগে চলিলো, আর সাধু আঁড়ী থেকে মধু খায়।)

রহিম: এ সাধু বাই করচিস কি? মধু খাচ্ছিস?

সাধু : ওরে না— না, পোয়া পড়ছিলো কিনা তাই ফেইলা দিচ্ছিলাম।

রহিম : এ সাধু বাই পোয়া ফেলচ্ছিস তো। তোর দাড়ীতে মধু ক্যান?

(রহিম সাধুর দাড়ী চাটতে লাগিলো।)

সাধু : এ আলার পো ব্যাটা আলারা, মারে না সব ভূত বানাই দেবো। চল চল— সব লায় চল।

(পুনরায় আঁড়ী তুলে দিয়ে সকলে প্রস্থান
ধনা ও মাঝিগণের প্রবেশ)

ধনা : সাধু ভাই তোমরা সমস্ত মধু ফেলে দিয়ে মোম বোঝাই করো। মধুর চেয়ে মোমের দাম অনেক বেশি। (প্রস্থান)

মাঝিগণ : আরে ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা পোয়ার গু। ওয়াক থু-থু এমন লেয়ে মাহাজন লায় আয়ছি বাদায়। মধু ফেলে দিয়ে পোয়ার গু বোঝাই করবে।

সাধু : এ রহিম লে— লে, লেয়ে মাহাজন যা বলে তাই কর। (সকলে মধু ফেলতে লাগিলো)

এ রহিম দ্যাখ দ্যাখ এহান থেকে চার বাঁক পর্যন্ত মধু ভর্তি হয়ে গেছে। এখানকার নাম আইলো মধুখালী। (সবাই— হ-হ— মধুখালী)।

রহিম : এ সাধু বাই লায় চল লায় চল— আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

(সকলে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(দুখের প্রবেশ)

দুখে : তাই তো বেলা যে অনেক হল। চাচাতো এখনো নৌকায় ফিরলো না। না— না ঐতো সবাই আসছে। (মাঝিগণের প্রবেশ।)

ধনা : সাধু ভাই তোমরা সকলে খেয়ে নাও। এই জুয়ারে নৌকা ছাড়তে হবে।

রহিম : (রাগিয়া) এই চল চল। আর খাইতে হবে না। আর খাইতে হবে না। ছাড় ছাড় লা ছাড়।

সাধু : এ রহিম রাগারাগী করচিস্ ক্যান খেয়ে লে।

রহিম : আগে হাড়ী দেখে আয়। বরকত হোয়েছে কিনা,

আলগজ : আর খাইতে অইবে না। এই এক মুষ্ঠা বাত কার হইবানে।

(সবাই হাঁড়ি দেখে রেগে ওঠে দুখের উপর)

দুখে : তোমরা সকলে বসো। না কুলায় আমি দায়ী।

ধনা : তোমরা গন্ডোগোল কর না, দুখে যা বলে তাই করো।

সকলে : এই মোরা রইলাম, দে দেহী। যদি না কুলায় তোরে খাইয়া ফেলবানে। (রাগত ভাবে খাইতে বসে)

দুখে : (ভাত দিলো) মাঝিগণ, তোমরা খাওয়ার সময় বিছমিল্লার নাম করে খেও।

সকলে : আরে রেখেদে তোর বিছমিল্লা, আমাদের কুলোয় না তার উপর বিছমিল্লা।

দুখে : মাঝিগণ তোমরা খাওয়ার সময় মা বনবিবির নাম করে খেও।

সকলে : আরে রেখেদে তোর বনবিরেল, খাওয়ার সময় যত সব কুটুম যোগাড় হয়েছে। কোথায় বনবিরেল, কাঠ বিরেল, মেচি বিরেল।

(মাঝিগণ খাইতে খাইতে বলিতে লাগিলো।)

অলগজ : দুখের হাতের খানা— না। বোধ হয় মা বনবিবির সখা হয়েছে।

রহিম : আরে দুর, যে হেগে ছোঁচায় না, তার আবার বনবিবির সখা।

সাধু : এ রহিম তুই একটু আস্তে আস্তে খা। (রহিমের গলায় ভাত বাঁধিয়া যায়, বুক ফুলাতে ফুলাতে চিত হইয়া হাত পা ছিটকাতে থাকে)

আলগজ : (রহিমের গলা ধরে দাঁড় করায়, রহিম— রহিম বলে ডাকে)।

ফেরাজ : দোহাই মা বনবিবি (বলে রহিমের বুকে পা টানতে থাকে)।

সাধু : হায় হায় এ রহিম তোর কি আইলো। তোর বিবির সঙ্গে কবানে কি? দোহাই মা বনবিবি— দোহাই মা বনবিবি, এ রহিম— রহিম।

ফেরাজ : এ দুহে পানী নিয়ে আয়। (দুখে জল আনিলো রহিম জল খাইয়া ভালো হইয়া গেলো।)

সাধু : তোর আমি সব সময় কই তুই ব্যস্ত হোস্ না। তুইতো আর কথা শুনিশ না।

ধনা : মাঝিগণ যা বলে ছিলাম।

সকলে : আমরা পারবো না।

ধনা : তোমাদের পঞ্চাশ টাকা দেবো।

সকলে : না— না হবে না।

ধনা : তোমাদের একশত টাকা দেবো।

সকলে : এইবার হইতে পারে।

(সাধু, রহিম, ফেরাজ, আলগজকে এক জায়গায় ডেকে।)

সাধু : এ রহিম কি করা যায় ক-তো। কি করে ওকে বনে তুলে দেওয়া যায়?

রহিম : আমি ঠিক করে ফেলেছি। নৌকায় কাঠ নেই, কাট আনার ছল করে ওকে বনে তুলে দেওয়া যাক।

সাধু : ও ধনা বাই নৌকা তো ছাড়বো, কিন্তু রাধবার কাঠ কই। বাপ দুখে— যা বাপ কিছু কাঠ নিয়ে আয়।

দুখে : না— না, আমি পারবো না।

রহিম : কি পারবি না— বসে বসে খাবে। আর বন ভরে হাগবে। একটা কাজ করবে না। যা ওখান থেকে কিছু কাঠ নিয়ে আয়।

দুখে : (স্বগত) মা বনবিবি তুমি আমাকে রক্ষা কর মা।

রহিমঃ যা বাপ দুখে ত্যাড়াং করে লাফিয়ে পড়ে এক বোঝা কাঠ নিয়ে আয়।

দুখে : না-না আমি পারবো না। নৌকায় তো অনেক লোক আছে। তাদের বলো। চাচা— চাচা আমি বনে যেতে পারবো না।

ধনা : (স্বগত) না— না, আমি বলতে পারবো না, যে দুখে তুমি বনে যাও। স্বপ্ন মিথ্যা, কত লোক তো স্বপ্ন দেখে। সবি অলিক, সবই মিথ্যা। কে? সেই দক্ষিণ রায়, শত দক্ষিণ রায় এলেও আমি কর্তব্য কর্মে বিচলিত হবো না। (নেপথ্যে বাঘের গর্জন) এ সেই শব্দ। ঐ সেই দক্ষিণ রায়, না— না— পূর্ণ হবে প্রতিজ্ঞা মোর। রক্ষা করো

রায় ঠাকুর। আমি ভুল বলেছি প্রভু।

দুখে : চাচা ঐ দেখো বনের মধ্যে কিসের শব্দ।

ধনা : কাঠুরিয়াগণ বৃক্ষমূলে করিছে ছেদন।

ফেরাজ : যা বাপ দুখে জুয়ার হইয়ে গেলো।

দুখে : আমি তো কখনো বনে উঠিনি। তাই ভয় হচ্ছে।

সাধু : যা বাপ দুখে তোর কোনো ভয় নেই।

দুখে : তোমরা যতই বলনা কেন আমি পারবো না।

আলগজ : দাও তো ব্যাটার হাত পা বেঁধে তুলে দাও।

দুখে : ওগো মাঝিগণ তোমাদের পায়ে ধরি। চাচা তুমি নিষ্ঠুর হয়ো না।

রহিম : এই বাঁধ তো বেটাকে (দুখেকে বাঁধিলো)

(দুখের গীত)

বেঁধনা বেঁধনা মাঝিগণ আমায় বন্ধন জ্বালা সহে না
আমাকে বাঁধিলে জগৎকে কাঁদালে,
পাষাণ হৃদয় কি তোদের গলে না।
জননীজঠরে ছিনু যখন আমি
বাবা যে গিয়াছে মরিয়া।
আমার অভাগিনী মাতা আছে পথ চেয়ে
কে ডাকবে, মা বোল বলিয়া—
আমি ধরি তব পায় মাঝিগণ আমায়
এ বিপদ হতে রক্ষা করো আমায়।

দুখে : চাচা— চাচা আমাকে মুক্ত করে দাও। আমি আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

ধনা : (স্বগত) বজ্র তুমি এই নরপিশাচকে দেখতে পাচ্ছোনা। কালানল তুমি শত সহস্রশিখায় আমায় ভস্মীভূত করো।

রহিম : এই তোর মুক্ত করে দিলাম। যা শীঘ্র যা। এই আমি তোর কাজ বন্ধ করে দিলাম। এ বিলের নাড়া ও বিলের নাড়া, লেগে যা বাঘের বুকের হাড়া। তিন আঙ্গুল দিয়ে তুললাম মাটি, লেগে যা বাঘের দাঁত কপাটি। কার আজ্ঞে কামিনী ভূতের আজ্ঞে।

দুখে : চাচা তোমার খোদার দোহাই লাগে। আমাকে যেন ফেলে যেও না। (প্রস্থান)

রহিম : এই ছিটি খোল, কাছি কাট। নৌকার ডোরা কোপা। (প্রস্থান)

ধনা : দুখেরে দিলাম তুলে লেহ রায়মণি। ভাল-মন্দ দোষগুণ কিছু নাহি জানি। মুড়ামন কেন হয় বিচলিত। পুত্র বলে যারে দিয়েছি সম্ভাষণ। পিতার কর্তব্য এবে

করেছি পালন। জননীর বক্ষ হতে উপড়িয়া আনি। রাক্ষসের হাতে দিলাম নরবলি। বাঃ—বাঃ চমৎকার ধনা। তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস— পৃথিবীর বুকে। কোথায় বজ্রভীম ভৈরবনাদে গর্জে উঠ। এই মহাপাপীর প্রায়শ্চিত্ত হোক। (প্রস্থান)।

(এক বোঝা কাট নিয়ে দুখের প্রবেশ)

দুখে : চাচাজি— চাচাজি, এ্যাঁ কোথায় গেল? না— না, এ আমি কোথায় এসেছি। বোধায় ঐ খানে। চাচাজি, চাচাজি কৈ— কোথাও তো দেখতে পাচ্ছি না। না— না— না চাচা আমার চলে গেছে।

(গীত)

বলি ও— ও চাচাজী না ভিড়াও না ভিড়াও কেনারে
বিয়ে দেবে বলে চাচা— এনেছিলে বনে।
ভালো বিয়ে দিলে চাচা বাঘেরও সম্মুখে
দুখিনী মায়ের কাছে খবর কইও তারে।

দুখে : যাও চাচা মায়েরে দিও খবর। তোমার দুখেরে বাঘে খেয়েছে। তাই তো কোথায় যাই, কি করি। কে কোথায় আছো আমাকে রক্ষা করো। অভয় দাও।

(গীত)

(গীতকণ্ঠে ভক্তমালার প্রবেশ)
মা-মা বলে ডাক দেখি ভাই
ডাক দেখি বিপদ কালে।
মা-মা বলে ডাকলে ছেলে
মা কি ঘরে রইতে পারে।
মায়ের শ্রীচরণতরী ভরসা করি
ভাসাইও দেহতরীরে।
আবার মা হবেন কাণ্ডারী সুখে যাবে তরী
ভয় কি অকূল পাথারে।

(গীতান্তে প্রস্থান)

দুখে : যেওনা, যেওনা ভাই এই বিপদকালে আমাকে রক্ষা করো। অভয় দাও, ও কি? ওই তো বাঘের গর্জন। মা— মা বনবিবি। তুমি আমাকে রক্ষা করো। এসো মা, এই কি তোমার অভয়বাণী। ঐ বাঘ— মা— মা (ভূতলে পতন)

বাঘ আসিয়া দুখেকে খাইতে গেলো। সহসা বনবিবি আসিয়া বাঘের মুখে চড় মারিয়া দুখেকে কোলে নিলো।

বনবিবি : একি পূর্ণিমার চান্দ্র যে ভূতলে পতন। একি নাসিকায় বায়ু নেই। চক্ষে পলক নাই। আজ বুঝি আমার নামে কলঙ্ক হলো। জংগুলী— তুমি দুষ্ট দুরাচারকে

(দুখেসহ প্রস্থান)

ধরো।

জংগুলী : আরে আরে দুষ্ট দুরাচার, কোথায় গেলে পাইবি নিস্তার। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল খুঁজিয়া মারিবোরে তোরে। (বাঘসহ প্রস্থান)

(রায় ও জংগুলীর প্রবেশ)

জংগুলী : আরে আরে দুষ্টবুদ্ধি দানব। ব্যাঘ্ররূপ ত্যাজি পুনঃ হইলিরে মানব। টিকিবে না টিকিবে না— কোনো মায়াবল তবো আজ জংগুলীর হাতে।

রায় : দূর হয়ে যা পাষণ্ড বর্বর। এত অহংকার তোর। জানিস আমি কে? দক্ষিণ রায় নাম মোর থর-হরি তিন পুর। নীচ জাতির মুখে উচ্চভাষা শোভা নাহি পায়। নিতান্ত মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে তোর।

জংগুলী : জানি জানি খুব জানি তোকে। ব্রহ্মাংশে লভিয়া জনম রাক্ষসবৃত্তি করেছিস অবলম্বন। সমচিৎ শাস্তি তার পাইবি এখনি।

রায় : থামরে থামরে জঘন্য কুকুর। দক্ষিণ রায় আজ জ্বলিয়া উঠিলো পর্বত সমান। ব্রহ্মাকোপে ভস্মিভূত করিবোরে অধম। পড়েছো যমের হাতে রক্ষা নাহি আর। খেদাড়াইয়া মারিবো তোরে পর্বত কন্দর। অতল জলধিতলে যদি বা লুকাও হাঙ্গব কুম্ভির আছে রক্ষা নাহি পাও। বায়ুভরে ওঠো যদি গগনমাঝারে, ডাকিনী-যোগিনী খাইবেরে তোরে। কেন বলে বলিয়ান পাষণ্ড বর্বর, ধরিয়া মুশিকোসম করিবো সংহার।

জংগুলী : কর্মে নাহি হবে তোর বাক্য আড়ম্বর— যুদ্ধেতে দেখাও দেখি তৎপর। বীর-চূড়ামণি হইলে সমর। নতুবা পতঙ্গসম জানিবো তোমার।

রায় : আয় তবে যুদ্ধের আশা মিটাই জন্মের মতো, কোথায় সনাতন?

(সনাতনের প্রবেশ)

সনাতন : আরে আরে পাষণ্ড যবন। সাক্ষাৎ কাল হের সম্মুখে তোমার, রক্ষা নাহি রক্ষা নাহি আর, হের রুদ্রমূর্তি প্রত্যক্ষ নয়ন— বাজিবে ঝঞ্ঝনা, রণে হবে অন্ধকার। চাই শুধু রণ, চাই শুধু নর।

(উভয়ে যুদ্ধ ও সনাতনের পলায়ন)

জংগুলী : তোর সহিত যুদ্ধ করে না পুরিলো সাধ।

রায় : বড় অহংকার হয়েছে তোর। অতিদর্পে হতলংকা, অতিদর্পে বালির পাতালে গমন। আর অতিমানে কৌরবের পতন। কত শক্তি ধরিয়াছো দেহেতে তোমার, জলে-স্থলে-ত্রিভুবনে সবই আমার চর। আদেশ করিলে তোর রক্ষা নাহি আর। খাইবে শকুনিসম ছিঁড়িয়া তোরে। আহার করিবে তোরে শৃগাল-কুকুরে। কত শক্তি আছে তোর পাষণ্ড পামর। মোর নামে কাঁপে এই বিশ্বচরাচর। আঠারো মরদের শক্তি এক বাহুতে মোর। মল্লযুদ্ধে মুষ্ঠাঘাতে দাঁত ভাঙিবোরে তোর। কোথায় ডাকিনী-যোগিনী ভূচর খেচর, পাষণ্ড যবনে আজি মার-মার-মার।

(ডাকিনী-যোগিনীর প্রবেশ ও যুদ্ধ)

জংগুলী : উঃ খোদা দানব দৈত্য গনের সনে বুঝি হয় পরাজয়। তাইতো কি করি উপায়। কালাম হ্যাকি কোথায় ফতেমা। আমার শক্তি দাও। আল্লাহু আকবর— আল্লা হু আকবর— আল্লা হু আকবর। (ডাকিনী-যোগিনীর প্রস্থান)

রায় : উঃ কি বিকট রব। আর সহ্য করা যায় না। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। তবে এইবার দেখবো কত ক্ষমতা করেছিস সঞ্চয়।

জংগলী : হা-হা-হা পতঙ্গের পাখাহেরি পর্বত লঙ্ঘিবতে তোরে করেছি স্মরণ। তাই হেরো উঠেছে পালক। তিল তিল করি শৃগাল কুকুরে তোরে করিবে আহার।

রায় : আয় দেখি কত শক্তি করেছিস সঞ্চয়। (উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান, পুনরায় রায় ও জংগুলী যুদ্ধরত অবস্থায় প্রবেশ ও প্রস্থান)

(গীত)

মাগো এই কি সেই কেঁদোখালী— মা গো
এই খানেতে ধোনাই মৌলে দুখের দিল বনে তুলে।
এই খানেতে রায়মণি হায় দুখের নিল নরবলি।
ধন্য মাগো ধন্য তুমি, দুখে হল পরশমণি।
এত কাঁদি পাইনা তবু— আমি কি তোর চোখের বালি।

পঞ্চম দৃশ্য

(বরখান গাজীর প্রবেশ)

বরখান : তাই তো আমার মনটা এমন বিচলিত হচ্ছে কেন। তবে কি আমার বন্ধুর কোনো বিপদ হলো নাকি! ঐ তো কে একজন এদিকে ছুটে আসছে না?

(দ্রুত দক্ষিণ রায়ের প্রবেশ)

রায় : কোথায় যাই, কোথায় পালাই কে কোথায় আছো আমাকে রক্ষা করো।

বরখান : একি বন্ধু! তুমি এমন ত্রাশিত হচ্ছো কেন?

রায় : শোনো বন্ধু, ধনা নামে মৌহলে এক এসেছিলে বনে। দুখে নামে কর দেয় দুখিনীর ছেলে। উল্লাসিত যাইনু গ্রাসিতে। এক ছোকরা এক ছুকরী এলো কোথা হতে। ছুকরীর রূপের কথা কহনে না যায়। কেঁদোখালী বন যেন হলো আলোকময়। যেন সন্ধ্যারবি উদিত আকাশে। ব্যাটার বিক্রমের কথা আমি কি কব হুজুরে। এক চড় মেরে মোরে দিলো সুবাইয়ে। বড় আশায় বঞ্চিত করিলো উভয়ে। কি এক বিকট আল্লা- আল্লা রব, বোঝানো না যায়।

বরখান : কেন বন্ধু আমি তো পূর্বেই বলেছি যে, তুমি ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। ওরা সাধনায় পীর হয়েছে। ওদের সংগে লড়তে তোমার শক্তিতে কুলাবে না।

রায় : বন্ধু সামান্য মানবে মোরে কি করিতে পারে। কিন্তু কি এক আল্লা-আল্লা রব। আমার সমস্ত ডাকিনী-যোগিনী পলায়ন করেছে। কি বিকট রব।

বরখান : বন্ধু, ও সব হচ্ছে সাধনার জিনিষ, ও কালামের কাছে তোমার ছত্রিশ কোটি দেব-দানব টিকিতে পারবে না।

রায় : তাহলে বন্ধু আমার উপায়?

(জংগুলীর প্রবেশ)

জংগুলী : তোমার উপায় আমি করছি সদয় হইয়া। মুহূর্তে পাঠাইবো তোরে শমন আলয়।

বরখান : কে? জংগুলী ক্ষান্ত হও বাবা ক্ষান্ত হও।

জংগলী : ক্ষান্ত হবো— ওকে আগে বন্দী করিবো তবে।

বরখান : আচ্ছা, বন্দী করবে এই তো, তার জন্য আর চিন্তা কি? না হয় আমি বন্দী করে দিচ্ছি।

জংগুলী : তুমি কে?

বরখান : আমি বরখান গাজী।

জংগুলী : তুমি যেই হও, ওকে ছেড়ে দাও। নচেৎ আমার সঙ্গে যুদ্ধে রত হও। আমি আর তিষ্ঠাতে পারছি না।

বরখান : না— না বাপু, আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবো না। তুমি বন্দী করবে তো। কিন্তু এখন উনি আমার আশ্রিত। আমি কেমন করে ওকে ছেড়ে দিই। তুমি তো বীর,বলোতো এটা কি বীরের কাজ?

জংগুলী : তবে তুমি কি বলতে চাও বলো। আমি তোমাকে অবসর দিচ্ছি।

বরখান : চলো আমরা ভ্রুকুণ্ডিয়ায় মায়ের কাছে যাই।

জংগুলী : তাহলে ওকে বন্দী করে নিয়েই চলো।

রায় : কি? আমারে বন্দী করবি এত বড় সাহস? বরখান গাজী, তুমি বন্ধু নও। তুমি বঞ্চনকারী, পাষাণ, পিশাচ, স্বজাতী বলে আজ পৃষ্ঠপোষকতা করছো। যবন জাতীর পাপ-পূর্ণ-স্নেহ-মমতা কিছুই নাই। আছে শুধুই পৃষ্ঠপোষকতা আর হিংসা। তোদের যদি মায়া মমতা থাকতো, তোদের ঘরে কুলবতী সতী, সন্তান-সন্ততিকে ফেলে ক্ষণস্থায়ী সুখের আশায় নিকার গ্রহণ করতো না। তোদের চেয়ে বনের পশু তাদের স্নেহ মমতা আছে।

জংগুলী : উঃ আর সহ্য করা যায় না। আমার জাতির এতো বড় অপমান। আরে, আরে দক্ষিণ রায়— হয় জংগুলী না হয় তোরই জীবন শেষ। আয়রে দাম্ভিক বাচাল। চিরতরে ধরা হতে মুছে যাক দক্ষিণ রায় নাম।

রায় : আয় তবে মল্লযুদ্ধে হও হে তৎপর, জীবনে কত শক্তি করেছো সঞ্চয়। বীর কোনো দিন মৃত্যুভয় করে না। যায় যাবে যাক প্রাণ। থাকে যদি মান জীবনে অক্ষয় কীর্তি হবে স্থাপন। তথাপি শৃগালহস্তে হবোনা বন্ধন।

জংগুলী : আয় তবে যুদ্ধের আশা করিবো অবসান। (উভয়ে মল্লযুদ্ধ)

বরখান : বন্ধু শান্ত হও। জংগুলী ক্ষান্ত হও বাবা। কি করি সৃষ্টি বুঝি যায় রসাতলে। বন্ধু আমার অন্যায় হয়েছে। জংগুলী বাবা হয় আমাকে আগে হত্যা কর, নতুবা আমার এতে কলঙ্ক হবে। ক্ষান্ত হও বাবা ক্ষান্ত হও। চলো আমরা ভ্রুকুণ্ডিয়ায় মায়ের কাছে যাই। (উভয়ের হস্ত ধারণ)

জংগুলী : বরখান গাজী, রায়কে যেন ভগ্নির কাছে পাই। (প্রস্থান)

বরখান : চলো বন্ধু ভ্রুকুণ্ডিয়ায় মায়ের কাছে যাই। (উভয়ে প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(গীতকণ্ঠে মাঝিগণের ও ধনার প্রবেশ)

তর তরাইয়া বাইয়ারে ডিঙ্গা চলরে নাইয়া ঘাটে।
দ্যাশের কথা মনে হইলে দুঃখেতে পুরান ফাটে।
দক্ষিণ গাঙে পাল তুলে দে বদর বদর বইলা—
উজান সুজান লাগবে নারে লাগবে তরী ঘাটে।

সাধু : ও ধনা বাই, এই তো নৌকা ঘাটে লইয়া আইলাম, তারপর।

ধনা : তারপর চুপি-চুপি মাল সব তুলে ফেলো।

রহিম : ক্যান, চুপি চুপি ক্যান? আমরা কি চোর না ডাহাত?

ধনা : না—না, তোমরা তো জানো দেশে চোর ডাকাতের ভয়তো আছে।

ফেরাজ : তা একথা মন্দ লয়।

ধনা : আচ্ছা তোমরা একটা একটা করে ক্ষেপ নিয়ে যাও।

আলগজ : আর তুমি যাবে না?

ধনা : আমি গেলে তোমাদের মাল তুলে দেবে কে?

রহিম : আচ্ছা তুলে দাও। (মাঝিগণের প্রস্থান)

ধনা : বহিছে দক্ষিণা বায়ু উদাস হিয়ায়। গাইছে বিহঙ্গম মনের হরিষে। আর আমি কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিরাসার বাতি জেলেছি। খোদা চৌদ্দডিঙা মোম-মধু বোঝাই করে তো দেশে এলাম। কিন্তু দুখের মার কাছে কি বলবো? দুখের মার কাছে আমি কেমন করে একথা উচ্চারণ করবো, যে দুখেরে বনে কর দিয়েছি। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কি কু-কর্মই না করেছি। আমার এ পাপের পরিণাম কি হবে খোদা? জগতের লোকে সবাই বলবে ধনা বিশ্বাসঘাতক— ধনা বিশ্বাসঘাতক। (প্রস্থান)

প ঞ্চ ম অ ং ক

প্রথম দৃশ্য

(বনবিবি ও দুখের প্রবেশ)

বনবিবি : দুখে তোমার আর কোনো ভয় নেই। তুমি নির্ভয়ে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াও, আমার পোষা হরিণ আছে। তুমি তাদের সঙ্গে খেলা করো। একটা হরিণ শাবক আসছে। তুমি ওকে ধরে আনতে পারো দুখে।

দুখে : না মা, আমি তোমার কাছ ছাড়া থাকবো না। চাচা আমাকে ঐ ভাবে কাঠ আনতে বলে ফাঁকি দিয়েছে।

বনবিবি : দুষ্টু ছেলে, তোমার চাচা ফাঁকি দিছে বলে কি আমিও তোমাকে ফাঁকি দেবো?

দুখে : মা— ঐ দেখো কারা আসছে।

(আগে জংগুলী ও পিছনে দক্ষিণ রায় ও বরখান গাজীর প্রবেশ।)

জংগুলী : ভগ্নি এই সেই দক্ষিণ রায়। বহু কষ্টে ওকে ধরে এনেছি। এখন বলো কি করতে হবে?

বনবিবি : আর তুমি কে?

বরখান : আমি বরখান গাজী। বাপের নাম হচ্ছে সাহা সেকেন্দার। বহুদিন হলো তিনি পরলোক গেছেন। বন্ধুর জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি মা।

জংগুলী : না— না— দক্ষিণ রায়ের কোনো ক্ষমা নেই। ভাবো দেখি গাজী সাহেব। এই টুকু দুগ্ধপোষ্য বালকের উপর যার একটু করুণা হয় না, ওকে কি শাস্তি দেওয়া কর্তব্য নয়?

গাজী : স্বীকার করছি মা কিন্তু এ বিরাট বনরাজ্যের শাসনকর্তা হচ্ছেন আমার বন্ধু। আর রক্ষাকর্তা আপনি। মা নারায়ণী যে আপনার ধর্ম সই। ইনি যে তাহারই সন্তান।

বনবিবি : তাহলে দক্ষিণ রায় আমার ছেলে এবং দুখেও আমার ছেলে। আর তুমিও আমার ছেলে। ভাই জংগুলী কি করা যায়?

জংগুলী : তুমি যা বলবে, আমি তাই করবো।

বনবিবি : এবার ওকে ক্ষমা করা যাক। কিন্তু রায় তুমি প্রতিজ্ঞা করো, যে বনে এসে আমার নাম স্মরণ করবে, তাকে তুমি কখনই আঘাত করবে না।

রায় : না— মা আমি তাদের কাছে চন্দ্র, সূর্য থাকতে যাবো না, কিন্তু মা বনে এসে সবাই মা-মা বলে মেদিনী কাঁপায়ে ডাকে। কিন্তু ভক্তি করে কয়জনে ডাকে। ভক্তিবিহীন মুড়ো মোর কাছে ক্ষমা নাহি পাবে। আর একটা কথা মা? আমাদের এই সখের রাজ্যে যদি অনাচার-অত্যাচার আরম্ভ করে, আর আমি যদি শাসন না করি, তাহলে জগতে মেয়ে-মরদে সকলেই মহল করিতে আসবে। আর আমাদের এই বনরাজ্য দু'দিনেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

বনবিবি : সত্য কথা বলেছো রায়। কিন্তু দুখের প্রতি তোমার বড় অবৈধ কাজ করা হয়েছে।

রায় : স্বীকার করি মা, ভাগ্যের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। তোমার নামের মহিমা কে জানতো? আজ দুখে হতে তোমার নামের মহিমা প্রচার হলো। দুখের মতো যারা ভক্তি করে ডাকবে, তাদের আমি কোনোদিন আঘাত করবো না।

বনবিবি : সে ভালো কথা, কিন্তু দুখের মতো অনাথ আর কেহো নেই। তোমরা সকলে ওকে সাহায্য করবে। বলো কি কি দেবে?

গাজী : আমি দুখেকে সাত মেটে টাকা দেবো মা।

রায় : আর আমি বলছি মা, দুখের যত পাতার প্রয়োজন হবে, আমি সারা জীবন ধরে যোগাবো।

বনবিবি : এ সমস্ত জিনিস দুখে পাবে কেমন করে?

গাজী : আমাদের নাম করে চাইলে দুখে বাড়ী বসে পাবে। এখন আমরা আসি মা।

বনবিবি : এস বন্ধু।

(উভয়ে প্রস্থান)

রায় : তাহলে আসি মা।

বনবিবি : দুখে তোমার সকল আসা পূর্ণ হলো। এখন তুমি দেশে যাও।

দুখে : না— না আমি দেশে যাবো না। সকলেই জানে যে দুখের বাঘে খেয়েছে। তুমি না থাকলে আমি তো বাঁচতাম না। এখন তুমি আমার সব। আমার আর কিছুর অভাব নেই মা।

বনবিবি : জংগুলী কি হবে?

জংগুলী : তাই তো ভগ্নি, দুখে যদি আমাদের এখানে থাকে তাহলে জগতের সবাই জানবে যে, দুখেরে বাঘে খেয়েছে। আমাদের এই কলঙ্ক চিরদিন থাকবে। আমাদের নাম আর প্রচার হবে না। দুখে— তোমাকে বাড়ী যেতেই হবে বাবা।

বনবিবি : তোমার মা তোমার শোকে কেঁদে কেঁদে পাগল হয়েছে। দুখে, ধনা গিয়ে তোমার মাকে বলেছে দুখেরে বাঘে খেয়েছে। তুমি যদি না দেখা দাও, আমার নামে কলঙ্ক হবে। এবং আমার এ কলঙ্ক চিরদিন থাকবে।

দুখে : আমি বাড়ী গেলে তোমাকে আর পাবোনা।

বনবিবি : তুমি যখন আমাকে ভক্তি করে ডাকবে তখনই আমার দেখা পাবে। চলো আমি তোমার বাড়ী যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ভাই জংগুলী তুমি কুমির ডেকে নিয়ে এসো। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ছুরিসহ ধনার প্রবেশ)

ধনা : একে একে চারদিন হইলো উদিত। সদাচিন্তা মনে শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে। কি বলিবো পুত্রহারা জননীরে। যখন এসে সুধাবে কৈ ধনা আমার দুখে কৈ? তখন আমি কি বলিবো, ওরে ধনা তোর কি যম নেই। তোর মতো মহাপাপী এখন পৃথিবীর বুকে দাঁড়ায়ে আছে! এত অনাহার, অনিদ্রা, কিন্তু মরণের পথতো খুঁজে পাইনা! ঐ বুঝি আসে অনাথিনী দুখিনী। আমি পালাই পালাই, না— না পালালে তো নিস্তার পাবো না। হৃদয় ধৈর্য্য ধরো কঠিন হয়ে দাঁড়াও।

(বিবিজানের প্রবেশ)

বিবিজান : এই তো ধনা বাড়ী এসেছে। নৌকায় কতো সরঞ্জাম দেখছি। বাড়ীতে যাই আমার বাপধন দুখেও তো এসেছে। কৈ কৈ ধনা, আমার দুখে কই? একি ধনা—কিছু বলছো না যে, আমার দুখে কই? আমার কথার উত্তর দাও। বলো, বলো ধনা আমার দুখে কই?

ধনা : ভাবিজী ভাবিজী (কাঁদিয়া ফেলে)

বিবিজান : ওকি ধনা— আর কিছু বলছো না যে, বলো বলো ধনা আমার দুখে কই?

ধনা : দুখে একটু বনে উঠেছিলো। তাকে তাকে বাঘে—

বিবিজান : উঃ খোদা, হ্যাঁ— হ্যাঁ, কি বললে ধনা আমার দুখেকে বাঘে খেয়েছে? ওরে পুত্র দুখে... (মূর্চ্ছা)

ধনা : খোদা এখনো কি তোমার নভমার্গে বজ্র নেই। তাহলে আজ হতে জানলাম জগতে ধর্ম নেই। পাপ-পুণ্যের বিচার নেই। ভাবিজী— ভাবিজী না-না-না সব শেষ, হায় খোদা আমার মরণ কি নেই। আমার মনরথ আমি চালাবো। (ছুরি বাহির করিয়া নিজের বক্ষে আঘাত করতে গেলো) ভাবিজী— ভাবিজী (বিবিজানের জ্ঞান হইলো) তুমি পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নাও। তুমি আমার মৃত্যু দাও।

বিবিজান : হ্যাঁ, হ্যাঁ প্রতিশোধ নেবো— পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবো (বসিয়া) হায় ধনা কি শুনালি। কলিজা হইলো খালি, শোকের তীর হানলি মোর বুকে। দুখিনীর ধন নিয়ে কোথায় হারায়ে এলি। কে ডাকবে মা বলিয়া মোরে। হায়রে নয়নতারা কোথায় গিয়ে হইলি হারা। দেখা দে, দেখা দে আসিয়া, ছুটে এসে মা মা বলিয়া। ওরে ধনা তোর মনে কি এই ছিলো।

ধনা : আমাকে অভিশাপ দাও ভাবিজী। আমাকে অভিশাপ দাও, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

বিবিজান : হ্যাঁ তোকে অভিশাপ দেবো (২) না— না একি বলছি আমি, দুখে যে আমার বিয়ে করতে গেছে। ধনা যে দুখের বিয়ে দিচ্ছে। হা-হা-হা (প্রস্থান)

ধনা : চলে গেলো, পাগলিনী চলে গেলো, কোথায় জলে-স্থলে পড়ে প্রাণ হারাবে। যদি একটু সান্ত্বনা দিতে পারি। (প্রস্থান)

(বনবিবি ও দুখের প্রবেশ)

দুখে : মা— মা— গো তোমাকে ছেড়ে যেতে, আমার খুব ভয় হচ্ছে।

বনবিবি : তোমার কোনো ভয় নেই দুখে।

দুখে : মা একবার বাঘের মুখ থেকে উদ্ধার করেছো, আবার কুমিরের মুখে ফেলে দেবে?

বনবিবি : আমি তো কুমিরের পিঠে তোমাকে বাড়ী পাঠাবো। সে আমার ধর্মপুত্র, তোমার ধর্মভাই।

(জংগুলীর কুমীর নিয়ে প্রবেশ)

জংগুলী : এই তো ভগ্নি কুমীরকে নিয়ে এসেছি।

বনবিবি : বাপ কুমীর, দুখে তোমার ধর্মের ভাই। বনে এসে বিপদে পড়েছে। এখুনি ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। দুখে তুমি চোখ মুদ্রিত করে বসো। বাড়ী গিয়ে বরখান গাজীর নাম স্মরণ করলে, সে তোমাকে সাত মেটে টাকা দেবে। আর ধনার সঙ্গে যেন বিবাদ করো না, কারণ তারই জন্য তুমি আমাকে পেয়েছো।

দুখে : (মাকে ছালাম করিয়া কুমিরের পিঠে বসিতে বসিতে বললো) মা এই অধম সন্তানের কথা যেন ভুলে যেও না।

বনবিবি : না বাবা, তুমি যখন বিপদে পড়বে আমাকে স্মরণ করবে। আমি তখনই তোমার কাছে ছুটে যাবো। দুখে চলিয়া গেলো। চলো ভাই জংগুলী আমরাও যাই। (উভয়ে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য
(উদমাদিনী বিবিজানের প্রবেশ)
গীত

ও প্রাণের দুখেরে দাও দেখা দয়া করে।
ধনা বলে নিয়ে গেলো ঐ না গহন বনেতে।
আর না এলো ফিরিয়া কোলে,
আপন কর্ম দোষেরে।
আর কতকাল থাকবো আমি তোর পানে চাইয়ারে।
চক্ষু-কর্ণ অন্ধ হয়ে পথে পথে ঘুরিরে।
ও প্রাণের দুখেরে—

বিবিজান : কত আশায় বুক বেঁধেছিলাম। আমার অন্তিমের সম্বল, বার্দ্ধক্যের ভরসা একমাত্র দুখেরে লইয়া। ধনা তুই তাকে কোথায় হারায়ে এলি। এ্যাঁ, ঐ আমার দুখে না? ঐ তো ঐ তো দুখে বিয়ে করে ফিরছে। ঐ তো ধনা আমার দুখেকে বিয়ে দিয়ে বাড়ি আনছে। কি আনন্দ গো— আজ আমার কি আনন্দ। আমার দুখে বিয়ে করে বাড়ি আসছে। ওরে আমার হারানো ধন আমি ফিরে পেয়েছিরে— আমার হারানো ধন আমি ফিরে পেয়েছি। (পড়িয়া গেলো)

(কুমিরের পিঠে দুখের প্রবেশ)
(দুখের গীত)

কার কাছে যাবো গো আমি, রহিবো কোথায়,
বড় নিরুপায় আমি হায় (৩)
বাপ নাইকো মা নাইকো নাইকো মোর কেহো,
এ সংসারে আমি গো একা পাই না কারো স্নেহ।
যদি কেহো থাকো হেয়া, বুঝিয়া কাঙালের ব্যথা
অনাথ বলিয়া মাগো হও সদয়।

দুখে : ভাই কুমীর তুমি এবার যেতে পারো। তুমি গিয়ে মাকে আমার ছালাম জানাবে। (কুমীর চলে গেলো) এইবার আমি দেখি আমার অনাথিনী মা কোথায় আছে। ঐ তো একজন পড়ে আছে না। আমি তবে এই ধার দিয়ে যাই। না— না, বাঘের মুখ থেকে যখন উদ্ধার পেয়েছি তখন একটা মরা মানুষ দেখে, এই মেয়ে লোকটি কে? একি! এতো আমার হতভাগিনী মা জননী, মা-মা দেখো তোমার দুখে বাড়ী এসেছে। তাই তো মা আমার মরেনি। মা বনবিবি আমি বিপদে পড়েছি, মা বিপদে পড়েছি। আমার বিপদ হতে উদ্ধার করো। আমার মাকে চক্ষু-কর্ণ শ্রবণ শক্তি দাও।

বনবিবি : (নেপথ্যে) দুখে, আমার নাম নিয়ে তোমার মায়ের চক্ষু-কর্ণে তিনবার হাত বুলিয়ে দাও। সব ভালো হয়ে যাবে।

দুখে : দোহাই মা বনবিবি (৩বার) মা— মা— মা চেয়ে দেখো আমি বাড়ি ফিরে এসেছি। মা— মা— মা।

বিবিজান : কে? কে তুমি?

দুখে: আমি তোমার দুখে মা।

বিবিজান : না— না, আমার দুখেকে যে ধনা বনে নিয়ে গেছে, তাকে যে বাঘে খেয়েছে।

দুখে : মা— মা গো, বনে বনবিবি মা আছে, সেই আমাকে রক্ষা করেছে। আমি তোমার দুখে মা।

বিবিজান : এ্যাঁ তুমি আমার দুখে, আয় বাবা আমার বক্ষে আয়, (বক্ষে নিলো) হ্যাঁ বাবা তুই কেমন করে ফিরে এলি? ধনা এসে বল্লে যে দুখেরে বাঘে খেয়েছে!

দুখে : হ্যাঁ মা চাচা মিথ্যা কথা বলেনি। বনের মধ্যে বনবিবি মা আছেন, তিনি আমায় দয়া করে রক্ষা করেছেন।

বিবিজান : তবে তিনি যে দয়াময়ী মা। চল আমরা ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে মায়ের ধার শোধ করি।

গীত

শুনো নগর বাসী, তোমরা গো ভিক্ষা দাও
তোমরা সবে না দিলে ভিক্ষা
আমি ভিক্ষা কোথায় পাবোগো
ভিক্ষা দাও নগর বাসী ভিক্ষা দাও আমারে।
আমি মায়ের খয়রাত করি গো।

দুখে : এসো মা এখন আমরা বাড়ী যাই। (উভয়ে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য
(কোদাল নিয়ে দুখের প্রবেশ)

দুখে : কৈ গাজী ভাই, আমার টাকা দাও।

গাজী : (নেপথ্যে) দুখে তোমার বাড়ীর পশ্চিম ধারে যে তালগাছ আছে, তার নীচে সাত মেটে টাকা আছে।

(দুখে খুঁড়িয়া টাকা পাইলো, কিন্তু অত টাকা নিয়ে যেতে না পারিয়া চলিয়া গেলো। একদল চোর তাহা দেখিলো।)

(একদল চোরের প্রবেশ)

১ম চোর : এই, দুখে নাকি টাকা পেয়েছে?

২য় চোর : কোথায় রেখেছে জানিস?

১ম চোর : ঐ তাল গাছের নীচে দুখে কি যেন খুঁড়ছিলো।

২য় চোর : তবে চল, আমরা এই রাত্রে কাজ হাসিল করি। (খুঁড়িয়া সাপ দেখিয়া লাফাইয়া উঠিলো। পরে মেটে গুলি নিয়ে চলে গেল। (প্রস্থান)

(দুখে ও বিবিজানের প্রবেশ)

বিবিজান : টাকা যদি চোরে নিয়ে যায় কি করবি দুখে?

দুখে : কি করবো মা, আমি তো একা আনতে পারি না, কাল সকালে লোকজন নিয়ে আনিবো। এখন এসো ঘুমাই।

চোর : (টাকা আনিয়া দুখের বাড়ীতে দিয়ে চলে গেলো, এই নে তোর টাকা।

দুখে : (উঠিয়া) মা দেখো টাকায় ঘর ভর্তি হয়ে গেছে!

বিবিজান : তাইতো বাবা এতো টাকা কোথায় রাখবি বাবা!

দুখে : মা বনবিবি এতো টাকা আমি কোথায় রাখবো মা।

বনবিবি : (নেপথ্যে) দুখে কাল সকালে বিশ্বকর্মা এসে বাড়ী তৈরী করে দেবে।

দুখে : মা তবে আর ভাবনা কি? তুমি রান্নার ব্যবস্থা করো। আমি লোকজন নিয়ে আসি। এখনি হয়তো বিশ্বকর্মা এসে পড়বে। (প্রস্থান)

বিবিজান : আমি তবে এক কলসী পানি নিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(দুখের প্রবেশ)

দুখে : লোকজন সব ঠিক করে এলাম। এখন বিশ্বকর্মা এসে পড়লেই হয়।

(গীতকণ্ঠে বিশ্বকর্মার প্রবেশ)

(গীত)

বিশ্বকর্মা নামটি ধরে ডাকলে কে?
আমার হাটবার যো নেই ডান ঠ্যাঙে
ও পায় হঠেছে নালী—

সব খেলে থাকে ভালো ভাই
বাড়ে তাল খালী,
ও পায় হয়েছেরে ঘা
ও তার গলদ মেটে না—
আবার দিনের বেলা থাকে ভালো
রাত হলে পায় রস গলে।।

বিশ্বকর্মা : এই কি দুখের বাড়ী?

দুখে : হ্যাঁ, কে আপনি?

বিশ্বকর্মা : আমি বিশ্বকর্মা, মা পাঠায়েছেন, বাড়ী তৈরী করতে। কোথায় বাড়ী হবে?

দুখে : ঐ যে ঐ খানে।

বিশ্বকর্মা : আমার যোগান দেবে কে?

দুখে : আমি যোগাড় দেবো, কোথায় খলিপ ভাই?

(খলিপ মিয়ার প্রবেশ)

খলিপ : এই যে হাজীর।

দুখে : তুমি বিশ্বকর্মার কাজের জোগাড় দাও। আমি এখন আসি। আমার অনেক কাজ আছে। (প্রস্থান)

বিশ্বকর্মা : এই বেটা আমার কাজের জোগাড় দিতে পারবি তো?

খলিপ : হ্যাঁ, খুব পারবো।

বিশ্বকর্মা : আচ্ছা তোর নাম কি?

খলিপ : আমার নাম? আমার নাম খলিপ মিয়া।

বিশ্বকর্মা : তোর বাবার নাম কি?

খলিপ : আমার বাবার নাম বকিরুদ্দিন গাজী। আমার ঠাকুরদার নাম বছিরুদ্দিন চৌধুরী। আমার পো ঠাকুরদার নাম ভূতোচরণ ভট্টাচার্য্য।

বিশ্বকর্মা : থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না। ওর নাম খলিফ মিঞা, ওর বাবার নাম বকিরুদ্দিন গাজী। ঠাকুরদার নাম বছিরুদ্দিন চৌধুরি, আর পো ঠাকুরদার নাম ভূতোচরণ ভট্টাচার্য্য, যেন সব কুলে ওর জন্ম।

বিশ্বকর্মা : তুই লেখা পড়া জানিস্।

খলিপ : হ্যাঁ— হ্যাঁ, খুব জানি।

বিশ্বকর্মা : কোন্ ক্লাস্?

খলিপ : বিয়ে পাস্ মেট্রিক ফেল।

বিশ্বকর্মা : খুব ভালো হয়েছে। এবার সোজা হয়ে দাঁড়া, আমার এই বাঁশ খানা ধার দিই। (ধার দেওয়া শুরু করে)

খলিপ : ওরে আল্লারে। (খলিপ ছুটিয়া পালায় আবার ধরিতে আসে)

বিশ্বকর্মা : এই শালার ব্যাটা যাস কোথায়, দাঁড়া সোজা হয়ে দাঁড়া, আবার ধার দেওয়া শেষ করে কাঠ কোপায়? এই বেটা ধর সোজা করে ধর।

(খলিপ কাট ধরিলো আর বিশ্বকর্মা কোপাইলো)

খলিপ : কাট ছেড়ে দিয়ে, ওরে আল্লারে, আমার পানঠেসা লেগেছে।

বিশ্বকর্মা : এই ধর দড়িটা ধর— এবার বাড়ীর কাজ শুরু করি (খলিপ দড়ি ধরিলো) ডাইনে-বায়ে একটু দক্ষিণে একটু উত্তরে, এই ব্যাটা এই তো বাড়ী তৈরী হলো। তোর মনিবকে ডেকে দে। আমার টাকা কড়ি দিতে বল।

খলিপ : আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

(বিশ্বকর্মা গান গাইতে গাইতে উভয়ে প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(ধনার প্রবেশ)

ধনা : শুনলাম দুখে নাকি বাড়ী এসেছে। না—না তাই কি হতে পারে! অসম্ভব। তাইতো এটা কার বাড়ী। হঠাৎ কেবা বাড়ী তৈরী করলো। তবে কি সত্যই দুখের বাড়ী। তাহলে আমার আর নিস্তার নেই। দুখে জানতে পারলে এখুনি আমাকে মেরে ফেলবে। আমি পালাই। আমি পালাই। (দ্রুত প্রস্থান)

(দুখের প্রবেশ)

দুখে : কৈ হ্যায় দারোয়ানজী।

রাম সিং : যো হুকুম বাপুজী।

দুখে : যাও ধনা চাচাকে ধরে নিয়ে এসো।

রামসিং : যো হুকুম বাপুজী। (প্রস্থান)

দুখে : আজ আমি ধনা চাচার অনুগ্রহে এই বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী। চাচা আমাকে না নিয়ে গেলে, আমি এতো টাকা কোথায় পেতাম। আর দক্ষিণ রায় তো জোর করে আমাকে কর নিয়েছিলো। এর জন্য চাচা আমার দোষী নয়।

(বিবিজানের প্রবেশ)

বিবিজান : কৈ বাবা ধনাকে আনতে লোক পাঠায়েছো?

দুখে : হ্যাঁ— মা, এই মাত্র লোক পাঠায়ে দিয়েছি।

বিবিজান : তাহলে একটা ভালোরকম খানার ব্যবস্থা করতে হবে।

দুখে : হ্যাঁ— মা, খুব বড় একটা খানার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিবিজান : আমি একটা মতলব করেছি বাবা। ধনার মেয়েকে তোমার সাদী করতে হবে।

দুখে : তাই কি হয় মা। সে যে আমার চাচাতো বোন।

বিবিজান : তাতে কোনো দোষ নেই। আমাদের শাস্ত্রে আছে।

দুখে : ঐ চাচাজী আসছেন। তুমি এখন যাও মা। (বিবিজানের প্রস্থান)

(ধনা ও রাম সিংয়ের প্রবেশ)

রামসিং : হারে বাপুজী, এ লোকটা পানিসে পড়তে হ্যা। আমি উস্‌কো পাকড়ে কে লে আয়া।

ধনা : দোহাই বাবা আমাকে ক্ষমা করো।

দুখে : আপনার কোনো ভয় নেই চাচা, আপনি বসুন। আমার ছালাম গ্রহণ করুণ।

ধনা : আশীর্বাদ করি বাবা তুমি সুখে থাকো। হ্যাঁ বাবা, দুখে তুমি কেমন করে রক্ষা পেলে?

দুখে : চাচা— সে অনেক কথা, বনে বনবিবি মা আছেন। তিনি আমায় রক্ষা করেছেন, এবং কিভাবে সে বাড়ি পাঠিয়েছেন জানিনা।

(বিবিজানের প্রবেশ)

বিবিজান : এই যে ধনা ভাই এসেছো?

ধনা : ভাবিজী (২)

বিবিজান : আশীর্বাদ করি ধনা সুখে থাকো। আমার একটা কথা আছে।

ধনা : ভাবিজী— ভাবিজী আমায় ক্ষমা করো।

বিবিজান : না— না— সে কোনো দোষের কথা নয়। তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের সাদী দিতে হবে। এ মা বনবিবির আদেশ।

ধনা : আমার কোনো আপত্তি নেই। সেটা বাপুজীর মেহের বাণী।

দুখে : আমি আর কি বলবো। মায়ের আদেশ আমি লংঘন করতে পারি না।

ধনা : তবে প্রস্তুত হও বাবাজী, আমি আমার মেয়েকে নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

দুখে : রামসিং যাও সকলকে নিমন্ত্রণ করে এসো। (প্রস্থান)

দুখে : চলো মা আমাকে সাজায়ে দেবে চলো। চাচা এখনি এসে পড়বে।

বিবিজান : চলো বাবা তোমাকে সাজায়ে দিই। (উভয়ে প্রস্থান)

(বরবেশে দুখে ও বিবিজানের প্রবেশ এবং ধনা ও চম্পাবতীর প্রবেশ ও বিয়ে।)

স মা প্ত ।

প রি শি ষ্ট

ক. শব্দার্থ

সুন্দরবন অঞ্চলকেন্দ্রিক লোকনাটক 'দুখে যাত্রা'র শব্দার্থ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সংকলনে এমন কিছু শব্দ আছে যা শহরের মান্যচলিত ভাষা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। পৃথক এই কারণে সুন্দরবন অঞ্চলকেন্দ্রিক মানুষের জীবন জীবিকা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট 'দুখে যাত্রা'র বিষয়বস্তুর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আসলে দুখে যাত্রা' সুন্দরবনের আঞ্চলিক সংস্কৃতির অঙ্গ। যাত্রার কলাকুশীলবদের সঙ্গে সুন্দরবনের সম্পর্ক রক্ত-মাংসের মত। এখানকার সোঁদামাটির গন্ধ তাদের গায় এখনও। তাই সংকলিত নাটকের বিষয়কে সকলের বোধগম্য করে তোলার জন্য শব্দসংকলনের একটা গুরুত্ব থেকেই যায়। আঞ্চলিকতার পার্থক্যের দরুণ অন্যান্য অঞ্চলের 'বনবিবির পালা'র সঙ্গে কালীতলা অঞ্চলের 'দুখে যাত্রা'র শব্দসংকলনগত একটা আলামাত্রা আছে। আলোচ্য শব্দসংকলনের বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থ সেই মাত্রাকে স্পষ্ট করে। আশারাখি লোকনাটকের বিষয়বস্তুকে অনুধাবন করার জন্য আঞ্চলিক এই শব্দভাণ্ডার তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে।

অ :

অমরি— ঘরের ভিতর ধান রাখার পাত্র।

আ :

আড়ি— বেতের বোনা পাত্র, মধু ধরে রাখা হয় যে পাত্রে।

আশবাড়ি— ছাটায় রত (জঙ্গলে চলার সময়) তিন ব্যক্তির মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যার হাতে লাঠি বা কুরুল থাকে। সেই লাঠি বা কুরুলকে বলা হয় আশাবড়ি।

আড়িদার বা আড়েল— যার হাতে আড়ি থাকে (জঙ্গলে মধু ভাঙতে গেলে)

আনাগুলা— বিচার বুদ্ধিহীন

আলটা— মোট বইবার জন্য কাপড় বা খড়ের তৈরী পাগড়ী।

আলে দেওয়া— ঢেঁকিতে চাল ছাটায়ের সময় গর্তের মধ্যে ধান ওলোট-পালট করে দেওয়ার পদ্ধতি।

আটা— জঙ্গলে কাঁকড়ার রক্তকে আটা বলে।

আধানি— অর্ধ— জোয়ার

আগনিনা— বারান্দা

আল— বল্লা বা ভিমরুলের বা মৌমাছির বিষাক্ত হুল।

আলন্ত— কালো রং

আবডাল— আড়াল

আছমান— আকাশ

আয়েচে— এসেছে

আলোমাটি— সাদা মাটি

আখর— হাত দিয়ে কাঠ ছিদ্র করার যন্ত্র বিশেষ।

ই :

ইশ— নাঙলের প্রলম্বিত দণ্ড।

উ :

উটোন— বাড়ির সামনে খোলা প্রাঙ্গণ।

উন্নে— পূর্বদিন বা পরের দিন

উনসুরি-খুনসুরি— কথা বাড়ানো

উড়কিমালা— নারকেলের মালা দিয়ে তৈরী ডাবু।

এ :

এড়িয়ে— কোন কিছুর ছাল ছাড়ানো।

এককাড়ি— প্রচুর বা অনেকটা

এন্দারা— এই রকম

ও :

ওন্দারা— ওই রকম

ওচোল— বাগদার পোনা ধরা জালে ছোট ছোট পিন বাগদা যেখানে পড়ে।

ওম্ করা— কোন কিছুর গরম করা অর্থে।

ওবোস— কর্মের বিরতি বা খালি পেটে থাকা।

ক :

কম্ব— কাজ বা কর্ম

কামাই— রোজগার

কোড়া— গরানের লাঠি

কটা— মধু যে পাত্রে ঢেলে রাখা হয়।

কাঁক— কোমর

ক্যাওড়া পোক— জঙ্গলে কেওড়া গাছে থাকে যে পোকা।

কাঠোদা— যে অস্ত্র দিয়ে শক্ত কাঠ কাটা হয়।

কাপমৌ— মৌচাকের অগ্রভাগে মধুপূর্ণ স্থানকে।

কুই— জঙ্গলের মধ্যে উচ্চারিত সাড়া সৃষ্টিকারী ধ্বনি।

কাগেমৌলে— গাছে উঠে মধু যে কাটে।

কারোবন— ঘন জঙ্গল

কাঁচমলম— নৌকায় ডালির উপর যে কাঠ থাকে।

কোলেস্টার— মাছ ধরে রাখবার বড় বাক্স।

কড়— জঙ্গলে মাটির উপর দৃষ্ট পায়ের ছাপ।
কাঁকড়া— নৌকাকে জলে স্থির রাখার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ।
কড়-কড়া ভাত— যে ভাতে রান্নার পর জল দেওয়া হয় না।
কুড়েথালা— সাদা রঙের কানা উঁচু থালা।
কাড়িকাড়ি— প্রচুর বা বেশী অর্থে
কিস্তি— বড় কাঠের নৌকা
কোলা— আড়াল অর্থে বা আবডাল
কাঁটে— খেবলা জাল-র সঙ্গে যুক্ত লোহা।

খ :

খোল— গাছের বাকল
খোপা— লম্বা গরানের লাঠি
খাইখালাসি— চুক্তি ভিত্তিক চাষ
খোঁচা— শলাকা
খোঁচ— পায়ের ছাপ
খ্যায়— নষ্ট বা ক্ষতি।
খোড়ঙ্গ— গর্ত
খোবল— ফাঁকা স্থান বিশেষ।
খাবলা— ছোঁ মারা
খরি - লবন বেশি হয়ে যাওয়া

গ

গাতা— শ্রম বিনিময় করা।
গোলঘর— গোয়াল
গোটকরা— জড় করা
গোপা— কেটে ফেলা অর্থে
গাছো— গাছে থাকে যে
গোলকাঁকড়া— পাতি ছোট কাঁকড়ার থেকে একটু বড় লালচে রঙের কাঁকড়া।
গুয়ে আড়কেল— গো-সাপ
গচান— যে জিনিসের সাহায্যে মৌলেরা মধু ভর্তি আড়ি বহন করে।
গলুই— নৌকার মাথা
গুঁড়ো— নৌকা যার উপর বসে বাওয়া হয়।
গোছা— নৌকার গায়ে (ভিতরে) লাগানো কাঠ
গদ— চরে যেখানে নৌকা রাখা হয়।
গামটা— গাছের ছাল।

গোলপাতা— সুন্দরবনের জঙ্গলে গাছের নাম।
গবাট গবাট— তাড়াতাড়ি খাওয়া।
গপসো গপসো— তাড়াতাড়ি খাওয়া
গুরচাল— ঢপ মারা

ঘ :

ঘেব— জঙ্গলে চিহ্নিত কাঠ কাটার স্থান।

চ :

চামো গুলে— গুলে মাছের মত ছোট গুলে।
চাঁদা— জঙ্গলের মাছের নাম বিশেষ।
চিক্কিরমারা— বিদ্যুতের আলোর ঝলকানি।
চিঙুর মাছ— চিংড়ি মাছ
চুক্কর— চুপ করা অর্থে।
চাঁকা— স্বাদ নির্ণয় করা।

ছ :

ছাটা— জঙ্গলের পথ বিশেষ।
ছাঁটকাঁকড়া— নরম কাঁকড়া
ছই— নৌকার ছাউনি
ছিটে— গরাণ গাছের সরু ডাল।
ছালপাশ— গরানের জঙ্গল
ছোড়ন— চাবি

জ :

জিয়ারত : পিরের বা তাঁর সম্বন্ধীয় ব্যক্তির আত্মার শান্তি।
জল কেরালি— নদীতে থাকে যে বিষধর সাপ।
জুগো— যার গায়ে নৌকার দাঁড় চেপে বাঁধা হয়।
জারে গে— লবন বেশি হলে
জ্যান— নষ্ট করা
জিরোন— বিশ্রাম

ঝ :

ঝোরা— জঙ্গলে জল সরার স্থান।
কাঁই মাটি— শক্ত মাটি

ট :

টেম্বার— বড় কাঠের নৌকাকে
টেমি— লম্ফ

টয়টয়— আস্তে আস্তে
টেম্বার— গরান গাছের ছাল
ড :
ডিঙ্গিলাইয়ে— যে ব্যক্তি নৌকায় থাকে।
ডাবর— খুব নিচু জলময় স্থান।
ডোঙা— জল তোলা বা সেচন করার জিনিস।
ডেগের থালা— অ্যালোমিনিয়ামের থালা
ত :
তবলার ঘের— গেঁমো গাছের জঙ্গল।
ত্যার— ধানের জমিতে তৃতীয় পর্যায়ের কর্ষণ।
তেলিক বাড়ির বুড়ি— নদীতে থাকে এক প্রকার প্রাণী।
তালাক— জঙ্গলের চার প্রহর দিনকে তালাক বলে।
তেরিয়ান— তেজ দেখানো অর্থে।
তোরজাল— শোল, লাঠা, বোলমাছ ধরা হয়।
থ :
থোপা— নদীতে কাঁকড়া ধরার সিপ্ বিশেষ।
থুৎকুড়ি— ভুল হয়ে যাওয়া বোঝাতে।
থৈ— গভীরতা সূচক শব্দ।
দ :
দোয়া— ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা বা আশীর্বাদ।
দোন— সুতোয় বড়শী গেঁথে মাছ ধরার পদ্ধতি।
দেমন— ধান মাড়াইয়ের সময় গরু বাঁধা থাকে যে দড়ি দিয়ে।
ধ :
ধোলাই— বড় কাঠের নৌকা।
ধলো— সাদা
ন :
নড়কা— লম্বা লাঠি
নাদা— মাটির তৈরী জলের পাত্র।
নাবাল— নীচু স্থান
নড়া— দৌড়ানো অর্থে।
নাচপয়সা— পাঁচ পয়সা
নালা— জল ধরার স্থান।
নেযুদ— পাকা / চালাক অর্থে

নাবি— দেরিতে
প :
প : মৌমাছি
পেত্যে— প্রতিদিন
পলা— তেল তোলার পাত্র।
পাড়া— চার প্রহর রাতকে (জঙ্গলের ভিতর)
পাকা— মাটির তৈরী উনান।
পাতি— বেতের তৈরী চাল মাপার পাত্র।
পাটনাচ— নৌকায় কাঠের পাটাতন।
পাকে— বর্ষায় কৃষকের মাথায় পেপারের যে টুপি থাকে।
ফ :
ফৌদি— আকাশে নিম্নচাপ হলে সেই সময়কালকে।
ব :
বিছমিল্লা : ঈশ্বরের নামে।
বাউলে— মূলত জঙ্গলে যারা তুকতাক্ করে বা মন্ত্রতন্ত্র করে।
বাউলে— বাবলা গাছের ফল বিশেষ।
বুলেন— মধু ভাঙার সময় মৌপোকা তাড়ানোর জন্য ধোঁয়া দেবার বিশেষ উপকরণ।
বন্ধু— জঙ্গলে বাঘকে এই নামে ডাকা হয়।
বালেট— জঙ্গলে বাঘকে এই নামে ডাকা হয়।
বছর— জঙ্গলে দুপুর হয়ে গেলে মৌলেরা এই শব্দ ব্যবহার করে।
বরা— শূকর
বাঘ ঢোসা— বাঘের মত দেখতে প্রাণি।
বারবন— দূরের জঙ্গল
বাদা— জঙ্গল অর্থে
বাঁক— নৌকার তলের কাঠ।
বাড়ে— ধারে বা কাছে বা পাশে
বন্দ— জমির প্লট বা অংশ
বান— লম্বা মাটির তৈরী উনান।
বুটে— নৌকা চালোনায় ব্যবহৃত ছোট ছোট দাঁড়।
বেন— তরকারী
বাগাত— তাক বা লক্ষ্য
ভ :
ভড়— বড় কাঠ বোঝাই নৌকা

ভোমা— মৌমাছির বিষাক্ত আল বিশেষ

ভোকচান— খিদে পেলে যে হিক্কা ওঠে।

ম :

মটগরান— মন্দিরের মত লম্বা উঁচু হয়ে যে গাছ উপরে ওঠে।

মৌলে— যারা মধু কাটেন।

মহল— জঙ্গলে মধু কাটতে যাওয়াকে মহল বলে।

মড়ি করেছে— বাঘ যেখানে আছে অর্থে।

মড়ানি— নদীতে যখন জোয়ারের জল বাড়ে না।

মাইনে— মালিকের অধীনে থেকে কাজ করা।

র :

রোকা— জঙ্গলে উঁচু গাছে মধু কাটতে যে লম্বা লাঠি ব্যবহার করা হয়।

ল :

লম্বা— জঙ্গলে বিষধর সাপকে এই নামে ডাকা হয়।

লগা— লম্বা মাথা সরু লাঠি।

শ :

শয়াল— জঙ্গলের ভিতর তৈরী সীমানা সূচক পথ।

শ্যায়না— বড় অর্থে।

স :

সাঁদিয়েচে— প্রবেশ করা অর্থে।

সাজন— মধু সংগ্রহকারী দলের কর্তা।

সাংবাড়ি— গরাণের শক্ত লাঠি।

সরারো— জঙ্গলে মধু সংগ্রহকারী ব্যাক্তিরা খাওয়া দাওয়া অর্থে 'সরাব' শব্দ উচ্চারণ করে।

সোরা— নৌকা নদীর চরে যে পথে নামানো ও ওঠানো হয়।

হ :

হাড়কো মাটে— মধু রাখার বড় পাত্র।

'হু'— জঙ্গলে এক ছাটার সঙ্গে অন্য ছাটার ব্যক্তিদের মধ্যে সাড়া সৃষ্টিকারী ধ্বনি।

হিন্‌সে জোড়া— নৌকার দাঁড় যার গায়ে বাঁধা হয়।

হলবলে— নৌকাকে অনেকে হলবুলে বলে।

হাত্যে— বড় অর্থে

হাল— নৌকার বড় দাঁড়।

হেটকো— শক্তডাল

হুলো— বাঁকপূর্ণ কলোনী বা গ্রাম।

গ্রন্থপঞ্জি

আ ক র গ্র ন্থ

১. মরহুম মোহাম্মাদ খাতের. বোনবিবি জহুরানামা : নারায়ণী জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা, গওসিয়া লাইব্রেরি, ৩০ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।

২. আবদুর রহিম, বনবিবি জহুরানামা কন্যার পুঁথি, ওস্‌মানিয়া, ৩০ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ।

স হা য় ক গ্র ন্থ

৩. সেন, সুকুমার, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ১৪১৪ (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৮) কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্কলকাবের ইতিহাস, ৫ম স., এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি, কলকাতা ১৯৭০।

৫. দাস, গিরীন্দ্রনাথ, বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৮।

৬. ভট্টাচার্য, আশুতোশ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, ২০০৫ (৪র্থ মুদ্রণ)।

৭. আবদুল জলিল, এ. এফ. এম., সুন্দরবনের ইতিহাস, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ৪র্থ মুদ্রণ (২০১৪)।

৮. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮ (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬)।

৯. ভট্টাচার্য, গৌরীশঙ্কর, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, রবীন্দ্রভরতী বিশ্ব.বদ্যালয়, কলকাতা ১৪০৭ (প্রথম প্রকাশ ১৯৭২)।

১০. মিত্র, সনৎকুমার, বাংলা গ্রামীন লোকনাটক, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০।

১১. নস্কর, দেবব্রত, চবিবশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী : পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯।

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর, পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী ও লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, জুন ২০০১।

১৩. রক্ষিত, সমীর, দুখের আখ্যান, একুশ শতক, কলকাতা, ১৯৯৮.

১৪. মিত্র, শিবশঙ্কর, সুন্দরবন সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি. কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৮৮।

১৫. মিস্ত্রী, সুভাষ, লোকায়ত সুন্দরবন, লোক প্রকাশন, সোনারপুর, কলকাতা, ২০১৩।

১৬. সেনগুপ্ত, সুধীন, সুন্দরবন : জীব পরিমণ্ডল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা, ২০১৫।

১৭. শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম, সুন্দরবন্দের প্রান্তিক জীবন ও ঐতিহ্য, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, জীবন মণ্ডল হাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২০১৩।

১৮. জাকারিয়া, সাইমন, বাংদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮।

১৯. দাস, গৌতমকুমার, সুন্দরবন : মানুষ ও পরিবেশ, শরৎ বুক ডিস্ট্রিবিউটরস্, কলকাতা ২০০৮ (প্রথম প্রকাশ ২০০৫)

২০. প্রামানিক, শঙ্করকুমার, সুন্দরবন : জল-জঙ্গল-জীবন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ২০০৮।

২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান, ১ম খণ্ড, ১৯৯১, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ, ১-২ খণ্ড, ১৯৯৬-১৯৯৭, নিউদিল্লী, সাহিত্য আকাডেমি।

প ত্র - প ত্রি কা

১. সমকালের জিয়নকাঠি, সম্পাদক— নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, জীবন মণ্ডল হাট, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা :

ক। সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা (প্রথম খণ্ড), জুন, ২০১০
খ। সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা (দ্বিতীয় খণ্ড), জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১২
গ। সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা (প্রথম খণ্ড), ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০১০
ঘ। সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা (দ্বিতীয় খণ্ড), নববর্ষ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০০৮
ঙ। সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা (২য় খণ্ড), জানুয়ারী-জুন, ২০১৪
চ। সুন্দরবন : সমস্যা ও সম্ভাবনা-২, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৬।

প্র ব ন্ধ

১। 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্প', প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা, বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ৩২-৩৬। সম্পাদক : অজিত মণ্ডল। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প.ব. সরকার, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০০০।

২। 'বাংলাদেশ সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ'। মো. এমদাদুল হক। শ্রীখণ্ড সুন্দরবন। সম্পাদক : দেবপ্রসাদ জানা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫ (১ম প্রকাশ ২০০৪)।

৩। 'দক্ষিণবঙ্গের লোকদেবতা ও বাঘ', শ্রী সনৎকুমার মিত্র, বাঘ ও সংস্কৃতি, সম্পাদক : শ্রীসনৎকুমার মিত্র, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮০।

৪। 'সুন্দরবনের মধু আহরণ : মৌ-চোর', ড. কুতুবুদ্দিন মোল্লা, সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা (প্রথম খণ্ড), সম্পাদক : নাজিবুল ইসলাম সণ্ডল, সমকালের জিয়নকাঠি, জীবন মণ্ডল হাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, জুন ২০১০।

৫। 'বনবিবি', মহুয়া ঘোষ, লোকশ্রুতি, ২০শ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, জুন ২০০২।

৬। 'বংলা লোকনাট্যের আঙ্গিক অভিনয় রীতি ও মঞ্চ বৈশিষ্ট্য', পবিত্র সরকার, লোকশ্রুতি, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৬, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।

৭। 'বাংলার লোকনাট্য ও আলকাপ : বোলান গান ও বনবিবি, দিলীপ ঘোষ, লোকশ্রুতি, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৫, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।

৮। 'বনবিবি পালা ও লোকসমাজ' দুলাল চৌধুরী, লোকশ্রুতি, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯০, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।

দুখে যাত্রার তিনদিক খোলামঞ্চ।

লোকনাট্যের (দুখে যাত্রা) সাজঘরের চিত্র

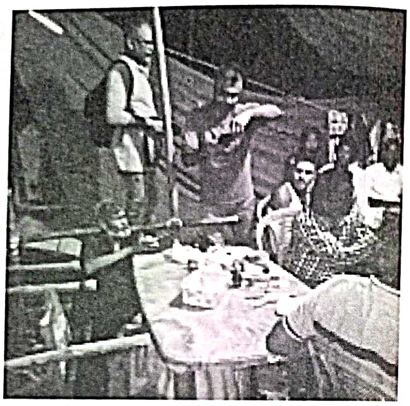

সাজঘরে লেখক যখন তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত

যাত্রায় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ব্যবহৃত প্রসাধনী দ্রব্য

চিন্তান্বিত ইব্রাহিম

'খোদা তোমার ইচ্ছায় পূর্ণ হোক'— বেরাহিম

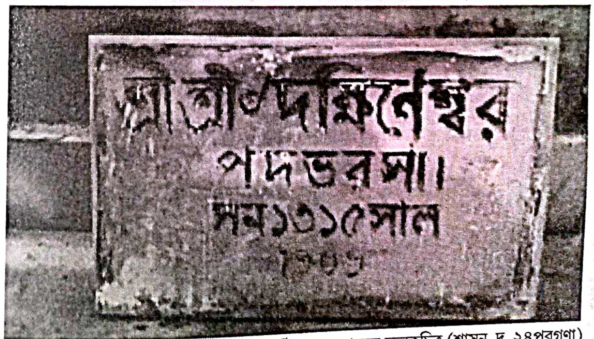

মন্দিরগাত্রে দক্ষিণেশ্বর নামাঙ্কিত মন্দির প্রতিষ্ঠিত সময়কালের ফলকচিত্র (শাসন, দ. ২৪পরগণা)

'আঠারো ভাটার মধ্যে উনি সবাকার মা।
যে ডাকে মা বলে, তার দুঃখ থাকে না।।'

'জঙ্গলী জ্বলিলো আজ পর্বত সমান।'— জঙ্গলী

'দণ্ডবক্ষ মুনি ছিলো ভাটার প্রধান
দক্ষিণ রায় নাম মোর তারই সন্তান।'
— দক্ষিণ রায়

দক্ষিণ রায়ের সেনাপতি সনাতন

মধুপূর্ণ আঁড়ি হাতে সাধুভাই (প্রধান মাঝি)

'শুনো বলি চাচা আমার
দুখের কথা কি বলিব আর।' (দুখে)

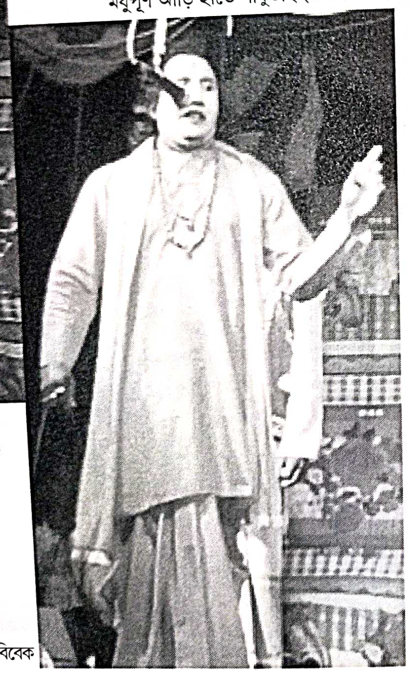

বিবেক

চিন্তান্বিত ধনা চাচা

আমি অভাগিনী এ জনম দুখিনী—
দুখে বই আর কেহ নাই, একবার ফিরে
আয়।' (বিবিজান)

দুখেকে হারিয়ে মায়ের পাগলিনী অবস্থার
দৃশ্যরূপ

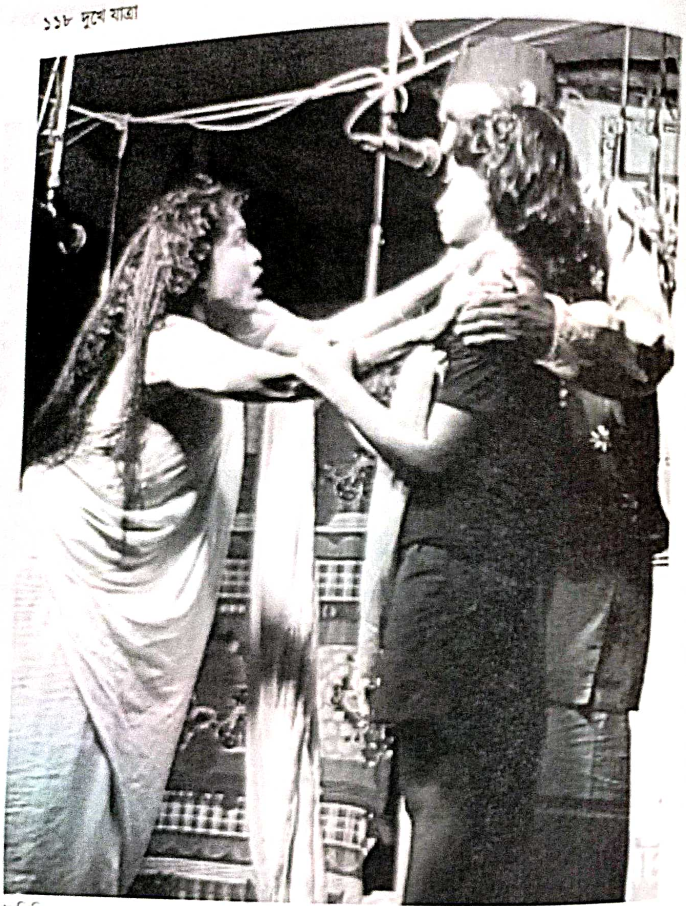

'দুখিনির ধন বনে গেলে কেমনে বাঁচিবে মায়ে,
হায় হায় এ দেহেতে প্রাণ রবে না।' (বিবিজান)

ইব্রাহিম ও গুলাল বিবি

বনবিবি ও শাহজঙ্গুলী

দক্ষিণ রায় ও সেনাপতি সনাতন

ধনা মৌলে ও তার ভাই মনোহর

মাতা ও পুত্রের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের একটি দৃশ্যরূপ

ধনার মুখে দুখের বাঘে ধরার সংবাদে মায়ের যন্ত্রণাময় আর্তনাদ

'সরে বসো তুমি, অন্ন রাঁধি আমি
মহলেতে ধনা আসিবার লাগি।"
— বনবিবি

দুখেকে বনবিবির আশীর্বাদ মুহূর্ত

ধনার মাঝি-মাল্লাদের ফটো চিত্র, সাদাচুলে সাধুভাই (প্রধান মাঝি) খালি গায়ে রহিম, বাম দিকে ফেরাজ ও ডানদিকে আলগজ।

মাঝি-মাল্লাদের নামাজের দৃশ্য

রহিম মাঝির একটি গীতের মুহূর্ত

বন্দুক হাতে বাবা দক্ষিণেশ্বর (দক্ষিণ ২৪ পরগণা, শাসন)

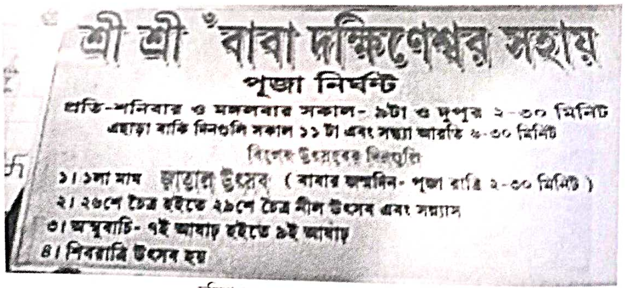

দক্ষিণ ২৪ পরগণার শাসন অঞ্চলে বাবা দক্ষিণেশ্বর পূজার নির্ঘণ্ট।

বনবিবির বাৎসরিক ও নিত্যপূজার মূর্তি, পাশে জঙ্গুলী ও নীচে কুমিরের পিঠে দুখে

খাঁড়া হাতে দক্ষিণ রায়ের পূজার মূর্তি

বড় খাঁ গাজীর সামনে জঙ্গুলী ও দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধমূর্তি

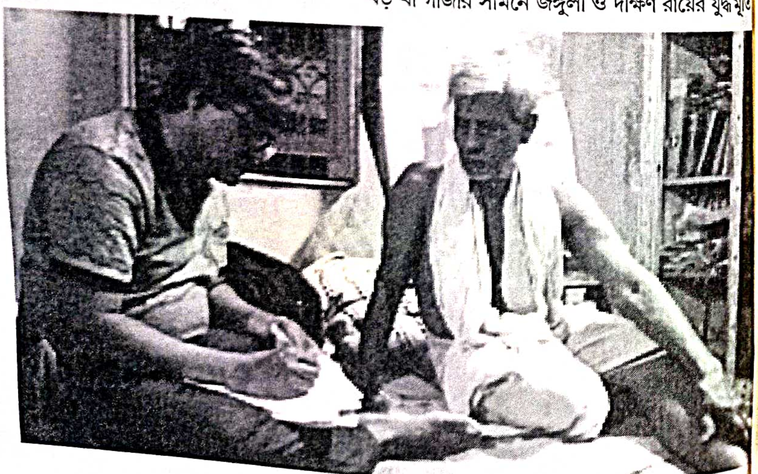

দক্ষিণেশ্বর পূজারীর কাছ থেকে লেখকের তথ্যসংগ্রহের চিত্র।

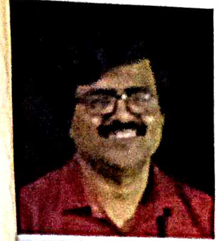

ধ্যাপক মোহিনীমোহন সরদারের জন্ম ১৯৭৩ সালে ক্ষিণ ২৪পরগণায়। লেখাপড়া কলিকাতা শ্ববিদ্যালয়ে। অর্জন করেছেন এম.ফিল, পি-এইচ.ডি, .লিট. ডিগ্রি। দীর্ঘদিন অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। ড়িয়েছেন রামসদয় কলেজ, আমতা, হাওড়া; চারুচন্দ্র ান্ধ্য কলেজ, কলিকাতা; শহীদ অনুরূপচন্দ্র হাবিদ্যালয়, বুড়ুল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা। বর্তমানে শ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত-এ কর্মরত। ংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। াগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ গবেষক ও াবন্ধিক। লিখেছেন— কবি কঙ্কণ চণ্ডী বৈচিত্র্যের নুসন্ধানে, Three Episodes from the Old Bengali Poem Candi.

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের জন্ম ১৯৮৪ সালে উত্তর ২৪ পরগণার সুন্দরবন-সংলগ্ন প্রত্যন্ত কালীতলা গ্রামে। পড়াশুনা গ্রামের পাঠশালায়। পরে দক্ষিণ ২৪পরগণার অমৃতনগর হাইস্কুলে। উচ্চতর শিক্ষা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। অর্জন করেছেন এম.এ ও এল.ফিল ডিগ্রি। প্রকাশিত গ্রন্থ— 'প্রান্তিক সুন্দরবন অঞ্চলের কথ্য ভাষা'।

পড়িয়েছেন সারদা মা গার্লস কলেজ, বারাসাত। বর্তমানে শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবড়া, বাংলা বিভাগে পূর্ণসময়ের চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সৃজনশীল লেখক।